স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
২য় বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ডিসেম্বর ১২-জানুয়ারি ১৩

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ স্নেহাশিস পাত্র

প্রচ্ছদ ❑

বিনিময় ২০ টাকা
প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

চিঠিপত্র ৫৭

শরীর
এ কি জ্বালা— ‘পোকা কামড়!’ ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৩
টেনিস এলবো ❑ ডা. বিতান কুমার দত্ত ৫
রক্তচক্ষু ❑ ডা. চন্দন বারি ৭
স্লিপড্ ডিস্ক ❑ ডা. সুব্রত গোস্বামী ১০
মলদ্বারে রক্তপাত ❑ ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী ও ডা. সুজয় বালা ১৩
গর্ভাবস্থায় ইউ এস জি ❑ ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ১৭
কেউটে ❑ ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার ১৯

শরীর সমাজ বিজ্ঞান
ভুল থেকে শেখা ❑ ডা. অসীম চ্যাটার্জি ২১
হাসপাতাল-লব্ধ সংক্রমণ— এক নিবারণযোগ্য মৃত্যুর কাহিনী ❑ ইন্দ্রানী দত্ত ২৫
হাসপাতালের অসুখ ❑ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ২৭
হাসপাতালে সংক্রমণ ❑ সত্য শিবরামন ৩০
এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প ❑ ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত ৩৩
দুই প্রতিজ্ঞার গপ্পো— সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও পোলিও ❑ ডা. প্রবীর চ্যাটার্জি ৩৮
সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস কী ও কেন? ❑ ডা. তাপস মন্ডল ৪১
প্রয়োজনীয় ওষুধ মানুষের নাগালের বাইরে ❑ ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য ৪৫

মন
সুখের ঠিকানা ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ৪৯

ডাক্তারের ডেস্ক ৩৭

স্মরণে
শ্যামলীদি ❑ প্রদীপ দত্ত ৫১

চলচ্চিত্রে ডাক্তার
এক ডক্টর কি মওত ❑ অংশুমান ভৌমিক ৫৫

কুইজ
অভিষেক দাস ১৫

সম্পাদকীয়

হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ

হাসপাতালে রোগ সারাতে গিয়ে নতুন কোনও রোগ হওয়াটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। ওষুধঘটিত রোগ, অপারেশন-ঘটিত রোগ, চিকিৎসা-বিভ্রাট জনিত রোগ তো আছেই, এছাড়া আছে হাসপাতাল থেকে পাওয়া জীবাণু-সংক্রমণ। হাসপাতাল-নার্সিংহোমের পরিবেশে রোগজীবাণু খুব বেশি, তারা আবার বহু অ্যান্টিবায়োটিকের সংস্পর্শে এসেছে, সেসব ওষুধের অনেকগুলি আর তাদের মারতে পারে না। হাসপাতালের রোগীর দুর্বল শরীরকে সহজেই এইসব জীবাণুগুলি আক্রমণ ক'রে কাবু করে, তখন তাদের মারতে পারে এমন ওষুধ পাওয়া কঠিন। তাই হাসপাতাল যাঁরা পরিচালনা করেন ও যাঁরা সেখানে কাজ করেন তাঁদের বড় দায়িত্ব হল রোগজীবাণুর ছড়িয়ে পড়া কমানোর জন্য যেসব পদক্ষেপ সারা পৃথিবীতে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে সেগুলো প্রয়োগ করা। এতে জীবাণু-সংক্রমণ একশ'ভাগ আটকায় না ঠিকই, কিন্তু অনেকটা কমে। আমাদের দেশে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে এ ব্যাপারে তেমন নজর দেওয়া হয় না, আর বহু রোগীকে তাঁদের প্রাণের মূল্যে তার মাসুল গুনতে হয়।

আমাদের আর একটা দোষ হল অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ (অপ-) প্রয়োগ। রোগীরা নিজেরা পাড়ার দোকান থেকে এলোমেলো অ্যান্টিবায়োটিক কিনে খান, কোর্স সম্পূর্ণ করেন না। অনেক ডাক্তারবাবু যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক না দিলেও চলে সেখানে তা দেন, যে রোগে যে অ্যান্টিবায়োটিক দরকার সেটার বদলে অন্য একটা দেন। আর আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিক-ব্যবহার-নীতি বলে কিছু নেই, প্রায় কোনও হাসপাতালের নিজস্ব অ্যান্টিবায়োটিক-গাইডলাইনও নেই। এর মিলিত ফল হয় এই যে জীবাণুগুলো সহজেই অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে ওঠে। আর সেই প্রতিরোধী জীবাণুকে মারার জন্য চিকিৎসকদের কোনও নির্দিষ্ট রীতি-পদ্ধতি নেই, এক-একজন চিকিৎসক এক-একরকম ওষুধের ফর্দ ধরান— এগুলির কোনটা কতটা কার্যকর তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত নয়।

এ বড়ো সুখের অবস্থা নয়। পরিবর্তন দরকার, আর তার জন্য চিকিৎসক-সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু আপনাকেও কিছু প্রাথমিক তথ্য জানতে হবে, নিজে এলোমেলো ওষুধ খাবার অভ্যাস ছাড়তে হবে, আর আপনার ডাক্তারবাবুকে তাঁর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনে হয়তো বা গঠনমূলক সমালোচনাও করতে হবে। এবারের **স্বাস্থ্যের বৃত্তে** আপনাকে এ-দায়িত্ব পালনে সাহায্য করতে পারলে তার প্রচেষ্টা সার্থক।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

এ কি জ্বালা— ‘পোকা-কামড়’!

চলতি কথায় বলে বটে পোকা-কামড়, পোকায়-চাটা কথাটাও চালু আছে। কিন্তু আসলে এটা বিভিন্ন ধরনের পোকার শরীর নির্গত রস থেকে ত্বকে প্রদাহ, ফোস্কা পড়া, জ্বালা ও দাগ হয়ে যাওয়া। আলোচনা করেছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস**।

সারাদিনের খাটুনির পর দিব্যি নাক ডেকে রাতের ঘুমটা হচ্ছিল— হঠাৎ একটু ব্যাঘাত— শরীরের কোথাও একটু জ্বলুনি অথবা কুটুস করে কিছু একটা কামড়ানোর অনুভূতি— কোনোটাই তেমন তীব্র নয়, তাই ঘুমের ঘোরে একটু চুলকে বা হাত বুলিয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়া... সকালে উঠেও ব্যাপারটা তেমন মনে থাকে না, কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়ে জায়গাটার দিকে— আরে? সাদাটে ফোস্কা— তার চারদিকে লাল হয়ে কেমন বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে, সঙ্গে ব্যথা, জ্বালা তো আছেই— ব্যাপারটা কী হল?,

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়— পোকার কামড়! পোকার ‘কামড়’ বলছি বটে, কিন্তু এটা ঠিক কামড় নয়। সে কথায় পরে আসব।

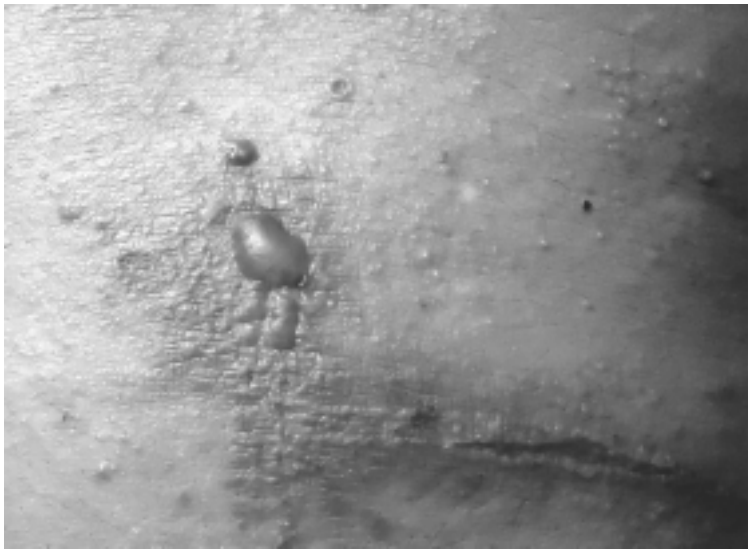

কত যে রোগী!

গরমকাল এবং বর্ষাকালে উপরের পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়নি পশ্চিমবঙ্গে এমন মানুষ কমই আছেন। বাংলায় আমরা পোকামাকড় বলতে যাদের বুঝি তারা বেশির ভাগই সন্ধিপদ প্রাণী। এদের মধ্যে মাকড়সা এবং বিছের কামড়টা একটু বেশি গুরুতর। অন্যান্য পোকার কামড়ে প্রাণের ভয় বা অন্য গুরুতর সমস্যা দেখা না দিলেও সাময়িক অশান্তি সৃষ্টি করতে এরা ওস্তাদ। অনেক সময় ঠিক কী হয়েছে বুঝতে না পেরে মানুষ একটু বিভ্রান্তও হয়ে পড়ে। বিছের বা বিষাক্ত মাকড়সার কামড়ের লক্ষণগুলো অবশ্য অনেকটাই আলাদা— এবং সেগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না।

সারা পৃথিবী জুড়েই সবচেয়ে বেশি যে ধরনের অতি নিরীহ দেখতে ছোটো ছেটো পোকা ‘খুচরো অশান্তি’ তৈরি করে তারা সাধারণত Coleoptera পরিবারভুক্ত এবং Paedarus জাতির— প্রজাতি অনেক অনেক আছে। লক্ষণ এবং চিকিৎসা এইসব প্রজাতির পোকার কামড়ে মোটামুটি একই— তাই ডাক্তারি পরিভাষায় চামড়ার এই সমস্যা দেখা গেলে তাকে Paedarus dermatitis বলে।

কামড় কিন্তু কামড় নয়

যদিও আমরা প্রথমেই বললাম পোকার কামড়, আসলে কিন্তু এই ধরনের পোকারা কামড়ায়ও না, হুলও বেঁধায় না। এদের দেহে ক্যান্থারাইডিন জাতীয় রাসায়নিক থাকে যা ত্বকের সংস্পর্শে এলে প্রদাহ ও আরো কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিস্টার বীটল ডার্মাটাইটিস (Bister beetle dermatitis)-এতেও রোগ-লক্ষণ একই রকম হয়। এর পোকাগুলো আলাদা ধরনের এবং তাদের রসে থাকে ‘ক্যান্থারাইডিন’ নামক প্রদাহ সৃষ্টিকারী পদার্থ। অনেক সময় ত্বকে পোকাটি বসার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা জায়গাটা হাত দিয়ে ঘষে বা চুলকে ফেলি, তার ফলে পোকার দেহ এবং দেহ নিঃসৃত রাসায়নিক আরো বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আক্রান্ত অঞ্চলে কখনো লম্বা লম্বা দাগ দেখা যায়— এটা যে রেখা বরাবর পোকাটি হাঁটে সেই অনুযায়ী হয়। অনেক সময় আবার মুখোমুখি দুটো গোল দাগ দেখা যায় (kissing lesion)— সাধারণত হাত বা পায়ের কোনো সন্ধির জায়গায় মুখোমুখি দাগ হয়। কারণ সন্ধিস্থল ভাঁজ করে মোড়ার সময় পোকাটির রস দুদিকের ত্বকের সংস্পর্শে আসে।

আক্রান্ত অঞ্চলের একদম মাঝখানে যে পুড়ে যাওয়ার মতো ফোস্কা হয় তার কারণ পোকার দেহের রাসায়নিকের প্রভাবে ওই অঞ্চলে ত্বকের উপরের স্তরের কোষমৃত্যু (necrosis) ঘটে। আশেপাশে অনেকটা অঞ্চল প্রদাহজনিত কারণে লাল হয়ে ফুলে থাকে। অনেক সময় নিকটবর্তী লসিকাগ্রন্থির স্ফীতিও দেখা যায় অর্থাৎ গ্ল্যান্ড ফুলে ওঠে। শুকিয়ে যাওয়ার পর বেশ কিছুদিন জায়গাটায় কালো দাগ থেকে যায় যা প্রসাধন-জনিত সমস্যার কারণ হয়ে ওঠে। মহিলার মুখ-মন্ডলে হলে তো কথাই নেই— পোকা কামড়ের জ্বালার চাইতেও এই পরবর্তী কালো দাগের মানসিক দংশনজ্বালা আরো কষ্টদায়ক।

কী করবেন?

তাহলে পাঠকদের এই নিরীহ ‘পোকা-কামড়’ চিনতে আর ভুল হওয়ার কথা নয়। এবার আসা যাক চিকিৎসার অধ্যায়ে। এই সমস্যার একদম নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই— আবার কোনো

চিকিৎসাই নেই বললে একটু ভুল হবে— কষ্ট উপশমের ওষুধ তো আছেই। আর এখন এই সদাব্যস্ত যুগে সবসময়ই আপৎকালীন পরিস্থিতি— প্রতিদিনই আমাদের সবার কোনো না কোনো জরুরি অ্যাসাইনমেন্ট— সে সময়ে মন এবং সেই সঙ্গে হাত যদি পোকা-কামড় নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে 'নম্বর' কমে যাবে যে!

যদি কামড়ানোমাত্র বুঝতে পারেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন— এতে ফোস্কা পড়াটা অনেকটা আটকানো যায়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনাটা রাতে ঘটে বলে ধোয়া আর হয়ে ওঠে না। এজন্য সবসময় মশারি টাঙিয়ে শোয়া অভ্যাস করুন— শুধু পোকা নয় মশাবাহিত অনেক রোগ থেকেও রেহাই পাবেন।

এরপর ক্যালামাইন লোশন লাগাতে পারেন— চুলকানি, জ্বালা সাময়িক হলেও কিছুটা কমবে। ক্যালামাইন লোশন দিনে বেশ কয়েকবারও লাগাতে পারেন। হালকা স্টেরয়েড জাতীয় মলমও লাগাতে দেওয়া হয় যাতে প্রদাহ কমে। কিন্তু সেটা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া করবেন না। চিকিৎসকের পরাামর্শ নিয়ে চুলকানো কমার জন্য ক্লোরফেনিরামিন ম্যালিয়েট বা সেট্রিজিন,

> যদি কামড়ানোমাত্র বুঝতে পারেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন

লিভোসেট্রিজিন জাতীয় অ্যান্টিঅ্যালার্জি ওষুধ খেতে পারেন। ফুলে যাওয়া বা ব্যথা বেশি হলে প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন জাতীয় প্রদাহ নিরাময়কারী ওষুধ বা ব্যথার ওষুধ ডাক্তারবাবু লিখতে পারেন। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যেকোনো ত্বকের ঘা-ই খুব তাড়াতাড়ি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রামিত হয়ে ওঠে। যদি এই সংক্রমণের ফলে দেখেন জায়গাটা পেকে গেছে, পূঁজ জমেছে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেতে হবে। এমনিতে পোকা কামড়ালেই কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পরবর্তীকালে কালো দাগটা যাতে চলে যায় সে জন্য অল্প কিছুদিন হাল্কা ধরনের স্টেরয়েড মলম লাগানো যেতে পারে।

অন্য অসুখ থেকে কীভাবে আলাদা করবেন?

পোকা-কামড়ে ত্বকের আক্রান্ত জায়গাটা দেখতে যতটা ভয়াবহ হয়ে ওঠে— অত ভয় পাবার কিছু নেই। আবার অনেক সময়ই হারপিস জোস্টার বা অন্যকিছু অপেক্ষাকৃত গুরুতর অসুখ, যাতে ফোস্কা হয়, তাকে মানুষ পোকা-কামড় ভেবে ভুল করে অবহেলা করে। হারপিস জোস্টারের চাইতে পোকা-কামড় আলাদা করে চেনা সবচেয়ে শক্ত। পাঠক বিগত সংখ্যায় (**স্বাস্থ্যের বৃত্তে**, আগস্ট-সেপ্টেম্বর) হারপিস জোস্টার নিয়ে লেখাটি পড়লে অনেকটা বুঝতে পারবেন। হারপিস জোস্টার-এ চামড়ায় ফোস্কা বেরনোর আগে থেকেই ব্যথা হয়, ব্যথার তীব্রতাও বেশি হয়। হারপিস জোস্টার শরীরের একদিকে (ডানদিক বা বাঁদিক) হয়, কদাচিৎ অন্যদিকে অল্পস্বল্প হতে পারে, এবং পোকার কামড়ে ফোস্কা যেমন অনেক দূরে বা শরীরের যেখানে সেখানে হতে পারে, হারপিস জোস্টার-এ সেরকম হয় না বললেই চলে— ব্যতিক্রম ডিসেমিনেটেড (disseminated) হারপিস। 'কিসিং লিজন' (kissing lesion)— অর্থাৎ শরীরের ভাঁজের অংশে, যেমন বগলে, যে দুটো জায়গার চামড়া পরস্পর ঘষা খায় সেই দু-জায়গার ক্ষত— এটা হারপিস জোস্টারে হয় না, পোকার কামড়ে হয়।

মুখের ওপর এরকম ফোস্কা পড়লে সেটা হারপিস সিমপ্লেক্স হতে পারে। একে বাংলায় 'জ্বর-ঠুঁটো' বলে বটে, কিন্তু ঠোঁট ছাড়াও মুখমন্ডলের ওপর যেকোনো জায়গাতেই হতে পারে, এমনকি অন্যত্রও হতে পারে। তার থেকে পোকা-কামড় আলাদা করা শক্ত। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণ জীবাণু সংক্রমণ জনিত ক্ষত, ইংরাজিতে বলে 'ইমপেটিগো' (impetigo)— তার সঙ্গে পোকা-কামড় আলাদা করা বেশ কঠিন।

শেষ কথাটা হল, যদি পোকা-কামড় বলে নিশ্চিত হয়ে চিনতে পারেন, আর যদি সেটা বাড়াবাড়ি রকম না হয়, তবে ক্যালামিন লোশন লাগিয়ে ঘরেই চিকিৎসা করতে পারেন, এমনকি চিকিৎসা কিছু না করালেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি হয়, বা যদি সন্দেহ হয় যে অন্য রোগও হতে পারে, তাড়াতাড়ি ডাক্তার দেখান।

- 'পোকা-কামড়' বলে বটে, আসলে তা পোকার শরীরের রস থেকে ত্বকে ফোস্কা পড়া।
- গরমকালে, বর্ষাকালে খুব দেখা যায়।
- হঠাৎ ফোস্কা, লালভাব আর জ্বলুনি— পোকা-কামড় হতে পারে।
- ফোস্কা ও লাল দাগের চেহারাটা অনির্দিষ্ট, এলোমেলো আকৃতির।
- বহু দূরেও একটা-দুটো লাল দাগ দেখা যেতে পারে।
- হারপিস জোস্টার থেকে আলাদা করে চেনা খুব দরকার।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এম বি বি এস, ডি ভি ডি, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালের চর্মরোগ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

টেনিস এলবো

কর্মব্যস্ত জীবনের এক পেশাগত রোগ

কর্মব্যস্ত জীবন। তার উপর ঘর-সংসারের কাজ। সব কাজেই হাত লাগাতে হয় আমাদের। আর এই কাজ করতে করতেই কনুইয়ে ব্যথা। ও কিছু না, সাধারণ ব্যথা। সত্যিই কি তাই? নাকি 'টেনিস এলবো'? লিখছেন **ডা. বিতান কুমার দত্ত**।

ক্রীড়াজগতের অনেক তারকা-মহা-তারকাদের প্রায়ই টেনিস এলবো নামক এক রোগ হয়েছে বলে শোনা যায়। রোগের নাম শুনেই মনে হয় এই রোগের সাথে বোধহয় টেনিস খেলার কোনো সম্পর্ক আছে। হ্যাঁ, তা অবশ্যই আছে। কিন্তু আমরা কি জানি যে এই রোগ সাধারণ মানুষের হতে পারে কিনা বা হলেও তার গুরুত্ব কতখানি? আসুন জেনে নেওয়া যাক টেনিস এলবো রোগটা আসলে কি, কেন হয়, কাদের হয় বা হলে তার প্রতিকার কি?

আমাদের হাতের কনুইয়ের বাইরের দিকে প্রদাহজনিত কারণে যে ব্যথা হয়, যা নির্দিষ্ট কিছু কাজের সময় বেড়ে যায় (যেমন কোনো কিছু শক্ত করে ধরা) সেটাই সাধারণ ভাবে টেনিস এলবো নামে পরিচিত। ডাক্তারি পরিভাষায় 'ল্যাটেরাল এপিকন্ডাইলাইটিস' বলে পরিচিত। যাঁরা টেনিস বা র‍্যাকেট জাতীয় জিনিস দিয়ে খেলার সাথে যুক্ত, তাঁদের প্রায় ৪০ শতাংশের মধ্যেই এই রোগ দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেছে খেলোয়াড়দের তুলনায় সাধারণ মানুষেরই এই রোগ বেশি হয়ে থাকে, যাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণ ব্যথা বলেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকি। অথচ, এই রোগ অনির্ণীত থেকে গেলে পরবর্তী কালে তা দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলে।

এই রোগ কেন ও কিভাবে হয়?

এই রোগ কিভাবে হয় বোঝার জন্য কিছু জিনিস জানা আবশ্যিক। আমাদের শরীরের পেশিগুলির যে অংশ হাড়ের সাথে গিয়ে লাগে, তাকে 'টেন্ডন' বলা হয়। আবার আমাদের উর্দ্ধবাহুর (arm)-এর সর্বনিম্নাংশ কনুইয়ের মধ্যে থাকে, যার বাইরের দিকের সুস্পষ্ট, উঁচু অংশকে বলা হয় 'ল্যাটেরাল এপিকন্ডাইল'। এই ল্যাটেরাল এপিকন্ডাইলে আমাদের হাত ও নিম্নবাহু (forearm)-এর সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পেশিগুলি একটি সাধারণ টেন্ডনের মাধ্যমে আটকে থাকে। নিম্নবাহু ও কব্জির অতি সম্প্রসারণের জন্যই টেনিস এলবো হয়ে থাকে আবার যে সমস্ত কাজে আমাদের বারংবার কব্জির মোচড় দেওয়ার দরকার হয় (যেমন স্ক্রু-ড্রাইভার ঘোরানোর সময়) সেসব ক্ষেত্রেও এই রোগ হবার সম্ভাবনা প্রবল।

> খেলোয়াড়দের তুলনায় সাধারণ মানুষেরই এই রোগ বেশি হয়ে থাকে, যাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণ ব্যথা বলেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে থাকি।

প্রকৃতপক্ষে এই সব কাজগুলি করার সময় উপরোক্ত টেন্ডনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত (মাইক্রোটিয়ার - micro-tear) সৃষ্টি হয়। সময়ান্তরে, ঐ পেশিগুলির উপর্যুপরি ব্যবহার টেন্ডনের ক্ষুদ্র ক্ষত অংশে প্রদাহের সৃষ্টি করে যার ফলস্বরূপ কনুইয়ের বাইরের দিকের অংশে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়, এমনকি সামান্য ফুলেও যেতে পারে। মনে করা হয় হাতের 'এক্সটেন্সর কার্পি রেডিয়ালিস' নামক পেশির টেন্ডনের ক্ষতই টেনিস এলবোর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ি।

কাদের হয়?

১। ৪০ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যেই টেনিস এলবো বেশি হয়।

২। নারী ও পুরুষের মধ্যে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় একই রকম।

৩। কোনো কিছু শক্ত করে ধরে থাকা বা বার বার কব্জির সম্প্রসারণ করতে হয় এই ধরনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের এই রোগ হয়ে থাকে।

৪। যাঁরা বাড়ি রঙ করা, বাড়ি তৈরি করা, রান্নার কাজ বা লোহা-সীসার নলের কাজ করেন তাঁদের এটা হবার সম্ভাবনা প্রবল।

৫। টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন জাতীয় খেলাধুলার সাথে যাঁরা যুক্ত (বিশেষত যাঁরা ব্যাকহ্যান্ড শট বেশি খেলেন) তাঁদের এই রোগ হতে পারে।

৬। এ ছাড়াও অন্যান্য খেলোয়াড় যেমন ক্রিকেটার, তীরন্দাজ, শুটারদেরও এই রোগ হয়ে থাকে।

৭। কখনো কখনো বেশিক্ষণ ধরে কমপিউটারের মাউস ও কি-বোর্ড ব্যবহারের দরুণও এই অসুবিধা দেখা যায়।

রোগীর ইতিহাস ও রোগলক্ষণগুলি কী কী?

- এই রোগে রোগীরা মূলত কনুইয়ের বাইরের দিকে ব্যথা অনুভব করেন যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে।
- কোনো কিছু শক্ত করে ধরতে গেলে বা করমর্দন করতে গেলে রোগী অনুভব করে যে ব্যথা কনুই থেকে নিম্নবাহু থেকে হাতের পিছন দিকে সঞ্চারিত হচ্ছে।

- হাতের তালু নিচের দিকে করে কোনো কিছু তুলতে গেলে যন্ত্রণা হয়।
- কাপে চা ঢালা বা দরজার হাতল ঘোরানোর সময় এই ব্যথা বেড়ে যায়।
- কোনো রোগী হাতের তালুতে শক্ত করে কোনো জিনিস ধরতে অসুবিধা বোধ করেন।
- রোগীর কনুইয়ের বাইরের দিকের নির্দিষ্ট পয়েন্টে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়।
- সকালে ঘুম থেকে উঠে অনেক সময় হাত নাড়াতে অসুবিধা হয়।
- কব্জির সম্প্রসারণের সময় বাধা দিলে ব্যথা লাগে।

কোনো কিছু শক্ত করে ধরতে গেলে বা করমর্দন করতে গেলে রোগী অনুভব করেন যে ব্যথা কনুই থেকে নিম্নবাহু থেকে হাতের পিছন দিকে সঞ্চারিত হচ্ছে।

রোগ নির্ণয়

- চিকিৎসকেরা কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগীর ইতিহাস থেকে সহজেই এই রোগ নির্ধারণ করতে পারেন।

টেনিস এলবো-তে এক্সরে করলে তা স্বাভাবিকই দেখায়, তবুও এক্সরে করে দেখে নেওয়া উচিত অন্য কোনো রোগ বা হাড় ভাঙা আছে কিনা।

- এম আর আই করেও এই রোগ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু তা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ।

অন্য কোন কোন রোগ টেনিস এলবো বলে ভুল হতে পারে?

১। **গল্ফার এলবো ঃ** এই রোগে যন্ত্রণা কনুইয়ের ভিতরের দিকে হয়, বাইরের দিকে নয়।

২। আঘাতজনিত কারণে কনুইয়ের হাড় ভেঙে যাওয়া বা চিড় ধরা।

৩। আর্থ্রাইটিস।

৪। বার্সাইটিস (bursitis)।

৫। **রেডিয়াল টানেল সিন্ড্রোম ঃ** এক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ টেনিস এলবো রোগের চিকিৎসা করার পরও রোগলক্ষণগুলি থেকে যায়।

চিকিৎসা

১। হাতকে বিশ্রাম দেওয়া, বিশেষ করে যেসব কাজ করতে গেলে যন্ত্রণা হয় সেগুলো এড়িয়ে চলা।

২। দিনে ২-৩ বার বরফ লাগানো দরকার।

৩। ব্যথা কমাতে আইবুপ্রোফেন জাতীয় ওষুধ খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই ধরনের ওষুধ বেশিদিন যাবৎ খাওয়া উচিৎ নয় বলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

৪। টেনিস এলবো হলে 'কাউন্টারফোর্স ব্রেস' ব্যবহার করলে উপকার হয়।

৫। ফিজিওথেরাপি।

৬। ল্যাটেরাল এপিকন্ডাইলের যেখানে সাধারণ এক্সটেন্সর টেন্ডনটি সংযুক্ত থাকে সেখানে কর্টিকোস্টেরয়েড ইঞ্জেকশন ব্যথা ও ফোলা থেকে সাময়িক মুক্তি দেয়।

৭। এসব করার পরেও যদি ব্যথা ৬ থেকে ১২ মাসের মধ্যে না কমে সেক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে কোনো সার্জারি ছাড়াই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং এক্ষেত্রে খেলাধুলার পদ্ধতি, কার্যপদ্ধতি বা কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি ও ফলপ্রসূ।

এই রোগের ভবিষ্যৎ কি?

অধিকাংশ রোগীই শল্যচিকিৎসার সাহায্য ছাড়াই ভালো হয়ে যান। আর যাঁরা শল্যচিকিৎসা করান তাঁদেরও প্রায় সবাই সম্পূর্ণরূপে সেরে ওঠেন। কিন্তু এই রোগকে অবহেলা করলে তা দৈনন্দিন কাজ কর্মে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এমনকি ভবিষ্যতে শারীরিক অক্ষমতারও সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসকেরা কিছু সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগীর ইতিহাস থেকে সহজেই এই রোগ নির্ধারণ করতে পারেন।

টেনিস এলবো প্রতিরোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

- যদি খেলতে গিয়ে ব্যথা অনুভূত হয় তবে খেলাধুলার সময় কমান।
- এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ খেলাধুলা প্র্যাকটিস করবেন না।
- ক্রীড়াপদ্ধতি বা কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন করুন, যখন অসুবিধা বোধ করছেন।
- নিম্নবাহু ও উর্দ্ধবাহুর পেশিগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যায়াম করুন।
- খেলাধুলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ব্যবহার করুন বা দরকার হলে যন্ত্রপাতির পরিবর্তন করুন।

শেষ কথা

টেনিস এলবো আসলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ থেকে উদ্ভূত এক রোগ, যাকে অবহেলা করলে পরবর্তীকালে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই কনুইয়ের ব্যথাকে সাধারণ চোট-আঘাত বলে অবহেলা না করে বা অহেতুক ভয় না পেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

লেখক পরিচিতি : ডা. বিতান কুমার দত্ত, এম বি বি এস, একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে হাউস স্টাফ হিসেবে কর্মরত।

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে: একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস

রক্তচক্ষু

চোখ লাল হলেই অধিকাংশ মানুষ ধরে নেন কনজাংটিভাইটিস তথা 'জয় বাংলা', আর পাড়ার ওষুধের দোকান থেকে চোখের ড্রপ কিনে এনে লাগান। কিন্তু চোখ লাল হতে পারে অনেক কারণে এবং তাদের অনেকগুলিই সময়ে চিকিৎসা না করালে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে— লিখছেন **ডা. চন্দন বারি**।

রক্তচক্ষু বললেই ভেসে ওঠে রাগী মাষ্টারমশায় বা অভিভাবকের (অবশ্যই মা নন) মুখ। না, এই লেখা তাঁদের নিয়ে নয়। বরং সত্তর দশকের প্রথম দিকে 'জয় বাংলা' নামের শব্দটার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে এর। হ্যাঁ ঠিকই ভেবেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ওপার বাংলা থেকে যখন অগুন্তি মানুষ এদেশে আসতে বাধ্য হলেন তখন তাঁদের অনেকের চোখ টকটকে লাল হত। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায়, কনজাংটিভাইটিস (Conjunctivitis) বলা হয়। এখনও চোখ লাল হলে অনেকে প্রশ্ন করেন— আমার কি জয় বাংলা হয়েছে? সে সময় এটা মহামারির আকার ধারণ করে। কারণ এটা ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ। যার কনজাংটিভাইটিস হয়েছে সে নিজের চোখে হাত দেবার পর সেই হাত অন্য কোথাও রাখলে বা তাঁর ব্যবহৃত জিনিসপত্র (যেমন গামছা, কাপ, ইত্যাদি) থেকে জীবাণু অন্যের হাতের মাধ্যমে অন্যজনের চোখে পৌঁছে তাকে আক্রমণ করে। সেই কারণে বাড়িতে একজন আক্রান্ত হলে অন্যদেরও আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এক চোখে হলে অন্য চোখও দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে।

'কনজাংটিভা' (Conjunctiva) হল চোখের (eye ball) বাইরের সাদা রঙের এক আস্তরণ যা কর্নিয়া (চোখের মণি) ছাড়া বাকি অংশ ও চোখের পাতার (eyelid)-র ভেতরের অংশকে ঢেকে রাখে। কনজাংটিভার মধ্যে রক্তনালিকা থাকে। কনজাংটিভার প্রদাহকে কনজাংটিভাইটিস বলা হয়। তার ফলে রক্তনালিকাগুলো চওড়া ও দৃশ্যমান হয়ে চক্ষুকে রক্তচক্ষুতে পরিণত করে।

কনজাংটিভাইটিসের রকম-সকম

কনজাংটিভাইটিস মূলত দুরকমের।

১। জীবাণু ঘটিত

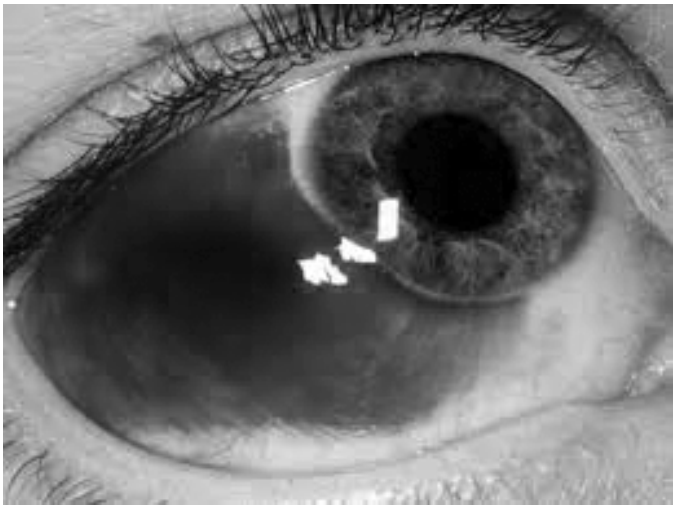

২। অ্যালার্জিক (কোনোকিছুর রি-অ্যাকশনের ফলে সংঘটিত)।

কনজাংটিভাইটিস প্রধানত অ্যাকিউট অর্থাৎ হঠাৎ করেই শুরু হয় ও দ্রুত সেরে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রনিক অর্থাৎ বেশ কিছুদিন ধরেই চলতে থাকে।

অ্যাকিউট জীবাণুঘটিত কনজাংটিভাইটিস-এর মূল কারণ ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস। চোখ লাল হয়ে গেছে, বেশি পিচুটি হচ্ছে, ঘুম থেকে ওঠার সময় দুচোখের পাতা জুড়ে থাকছে, চোখ খুলতে অসুবিধা হচ্ছে, কড়কড় করছে, চোখের পাতা ফেলতে অসুবিধা হচ্ছে— এগুলো সাধারণত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয়, আর এটা দুচোখেই হয়— প্রথমে এক চোখ পরে অন্য চোখ। চিকিৎসা হল তুলো গরমজলে ফুটিয়ে (১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে ফোটাতে হবে) অল্প ঠান্ডা করে চোখ পরিষ্কার রাখতে হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো অ্যান্টিবায়োটিক আই-ড্রপ প্রথমদিকে দিনে ১ ফোঁটা করে ৮-১২ বার, অসুবিধা কমে গেলে দিনে ৪ বার করে দিতে হবে। রাত্রে শোবার সময় চোখের পাতার ভেতর অ্যান্টিবায়োটিক চোখের মলম দেওয়া দরকার।

কনজাংটিভা থেকে কর্নিয়া

কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় চোখের পাতা ফুলছে, পিচুটির চেয়ে চটচটে জল বেশি বেরুচ্ছে, তার সাথে চোখের সাদা পর্দাটা ফুলে উঠেছে— এটা মূলত ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক আই-ড্রপ ও মলমের সাথে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো স্টেরয়েড আই-ড্রপ দিতে হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কানের সামনের গ্রন্থিতে (লসিকা গ্রন্থি) স্ফীতি দেখা দিতে পারে। সাথে জ্বর ও সর্দি-কাশি থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখ দিয়ে রক্ত পড়তে পারে। তবে ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে কর্নিয়াও আক্রান্ত হতে পারে। একে বলে ভাইরাল কেরাটাইটিস। সেক্ষেত্রে রোগী চোখে ঝাপসা দেখতে থাকে, কর্নিয়ার অনুভূতি কমে যায় ও রোদের দিকে তাকাতে অসুবিধা হয়। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত একটা চোখ আক্রান্ত হয়। এর চিকিৎসায় অ্যান্টি-ভাইরাল চোখের মলম এবং চোখের স্বাভাবিক জলের পরিবর্ত হিসেবে কৃত্রিম 'চোখের জল' দেওয়া হয়, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে। নিয়মিত চিকিৎসককে দেখানো এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ঠিকমত চিকিৎসা না করালে কর্নিয়াতে স্থায়ী দাগ থেকে যেতে পারে যা দৃষ্টিশক্তিকে কমিয়ে দেয়।

অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস

কনজাংটিভাইটিস-এর একটা সাধারণ ধরন বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায়। বাচ্চারা (মূলত ৫-১২ বছর বয়সি) সারাক্ষণ চোখ চুলকায় আর চোখ লাল হয়ে যায়, চোখ থেকে জলও পড়তে পারে। এই ধরনের কনজাংটিভাইটিস-কে বলা হয় ভার্নাল কনজাংটিভাইটিস (ডাক নাম স্প্রিং ক্যাটার)।

গরমকালে শুকনো আবহাওয়ায় ধুলো, ফুলের রেণু ইত্যাদি থেকে অ্যালার্জি হয়। এর চিকিৎসা হল চোখে স্টেরয়েড আই-ড্রপ দেওয়া। এটা বেশ কিছুদিন ধরে দিতে হয় আর যখন রোগীর অসুবিধা কমতে থাকে তখন আই-ড্রপ ক্রমশ বেশি সময় অন্তর অন্তর দেওয়া হয়। এর ফলে রোগটা তখন সেরে যায় কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে আবার হয়— কখনো বছরে একবার করে, কিছু ক্ষেত্রে একবছরেই কয়েকবার। সেজন্য বাবা-মা-রা খুবই চিন্তিত থাকেন। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় রোগের পুনরাক্রমণ হলেই তাঁরা পুরানো প্রেসক্রিপশন দেখে স্টেরয়েড আই-ড্রপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে দীর্ঘকাল ধরে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড আই-ড্রপ দিলে গ্লকোমা হতে পারে, বিশেষ করে যাঁদের পরিবারে গ্লকোমার ইতিহাস আছে। এমনকি অতিরিক্ত স্টেরয়েড ড্রপ ব্যবহারের ফলে চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। সেজন্য কোনো ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া স্টেরয়েড আই-ড্রপ ব্যবহার করা উচিত নয়। ভার্নাল কনজাংটিভাইটিস এমন একটা রোগ যা কয়েকবার আক্রমণের পর নিজে নিজেই সেরে যায়, ১৩-১৪ বছর বয়সের পর এ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় নেই।

রক্তচক্ষুর অন্যান্য কারণ

চোখে কিছু পড়লে চোখ লাল হয়। বিশেষ করে যদি একটা চোখ লাল হয়, জল পড়ে বা চোখের পাতা ফেললে কড়কড় করে বা অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে চোখে হয়তো কোনো বাইরের জিনিস পড়েছে। চিকিৎসককে দেখিয়ে নিতে হবে আর বাইরের জিনিস থাকলে তিনি তা বের করে অ্যান্টিবায়োটিক আই-ড্রপ লাগাতে দেবেন।

হঠাৎ চোখ লাল আর তার সাথে বেশ ব্যথা আর চোখে ঝাপসা দেখা— অনেক ক্ষেত্রেই এই অসুবিধায় আমরা কনজাংটিভাইটিস হয়েছে ধরে নিয়ে পাড়ার কোনো দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আই-ড্রপ (ওষুধের দোকানদারেরা মূলত Ciplox বা Renicol দেন) কিনে চোখে দিতে থাকি। তাতে না কমলে কয়েকদিন পর যখন ডাক্তারবাবুর কাছে যাই, তখন যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। প্রধান কারণগুলো হল—

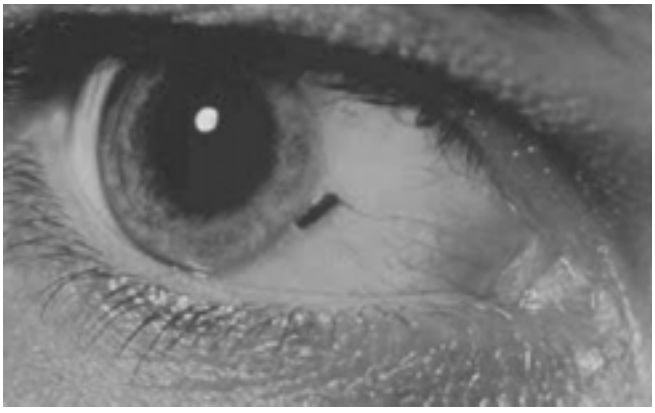

১। **অ্যাকিউট আইরিডো-সাইক্লাইটিস** (Acute iridocyclitis)

২। **অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা** (Acute angle closure glaucoma)

৩। **লেন্স-ঘটিত গ্লকোমা** (Lens induced glaucoma) ইত্যাদি।

অ্যাকিউট আইরিডো-সাইক্লাইটিস— কনীনিকা (iris)আমাদের চোখের রঙ নির্ধারণ করে (যেমন কটা চোখ, নীল চোখ ইত্যাদি)। কর্নিয়া ও চোখের লেন্সের মধ্যে পর্দার মতো আইরিস অবস্থান করে, যার মধ্যের ছিদ্র (pupil) দিয়ে আলো চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আইরিস তথা কনীনিকার প্রদাহের কারণে আইরিডো-সাইক্লাইটিস হয়। এই রোগের চিকিৎসা খুব দ্রুত শুরু না করলে দৃষ্টি চিরতরে কমে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রদাহের কারণে কনীনিকা ঠিক তার পেছনে থাকা লেন্সের সাথে সেঁটে যায়। যাঁদের বিশেষ ধরনের গাঁটে ব্যথা, কোমরে ব্যথা ইত্যাদি আছে, বা যাঁরা যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন তাঁদের আইরিডো-সাইক্লাইটিস হবার সম্ভাবনা বেশি। প্রধান চিকিৎসা হল— স্টেরয়েড আই-ড্রপ, তারারন্ধ্র প্রসারিত করার আই-ড্রপ। এইসব রোগীকে বেশ কিছুদিন ধরে নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে দেখানো প্রয়োজন।

হঠাৎ চোখ লাল আর তার সাথে বেশ ব্যথা আর চোখে ঝাপসা দেখা— অনেক ক্ষেত্রেই এই অসুবিধায় আমরা কনজাংটিভাইটিস হয়েছে ধরে নিয়ে পাড়ার কোনো দোকান থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আই-ড্রপ কিনে চোখে দিতে থাকি। তাতে না কমলে কয়েকদিন পর যখন ডাক্তারবাবুর কাছে যাই, তখন যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে।

অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা— মূলত মহিলাদের বেশি হয়। যাঁদের চক্ষু (eyeball) ছোটো, যাঁরা দূরদৃষ্টিতে ভোগেন (অর্থাৎ দূরের দৃষ্টির জন্য প্লাস-পাওয়ার ব্যবহার করেন) তাঁদের হবার সম্ভাবনা বেশি। চোখের ভেতরে যে জল থাকে তার যাতায়াত বাধপ্রাপ্ত হলে চোখের ভেতরকার চাপ হঠাৎ করে প্রচুর বেড়ে যায় (সাধারণত এই চাপ ১৬ থেকে ২২ মিমি পারদস্তম্ভের সমান থাকে, হঠাৎ বেড়ে তা ৫০ থেকে ৬০ মিমি দাঁড়াতে পারে)। এর ফলে দৃষ্টি স্নায়ু (optic nerve) নষ্ট হয়ে যেতে পারে, ফলে আমাদের দৃষ্টিশক্তি চিরকালের মতো কমে যেতে পারে, এমনকি অন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এর চিকিৎসা খুব দ্রুত শুরু করা দরকার। শিরার মধ্যে বিশেষ ওষুধ (ম্যানিটল) দিয়ে চোখের ভেতরকার চাপ কমাতে হয়, মুখে খাবার বড়ি (সাধারণত acetazolamide 250 mg ১ টি করে চার বার) এবং অন্যান্য ওষুধ দেওয়া হয়।

ছানি

ছানির একমাত্র চিকিৎসা অস্ত্রোপচার। অস্ত্রোপচারের ভয়ে যাঁরা ছানির চিকিৎসা না করিয়ে বসে থাকেন তাঁরা খেয়াল রাখুন ছানি পেকে যাবার ফলে চোখের ভেতর রি-অ্যাকশন হতে পারে ও তার ফলে লেন্স-ঘটিত গ্লকোমা হতে পারে। তখন অস্ত্রোপচার করিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফেরানোর আশা খুব কম।

হঠাৎ করে পরিচিত জনের ফোন— চোখ টকটকে লাল হয়েছে। সঙ্গে কোনো অসুবিধা (যেমন জল পড়া, পিচুটি কাটা, ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি) নেই। শুধুই চোখ লাল অর্থাৎ সহজ কথায় রক্তচক্ষু যা দেখে নিকটজনেরা প্রচুর ভয় পেয়েছেন। হ্যাঁ,

কনজাংটিভা-র তলায় রক্তপাত (sub-conjunctival haemorrhage) অর্থাৎ কনজাংটিভার নীচে ছোটো ছোটো রক্তনালি থেকে রক্ত বেরিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না (idiopathic)। কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের ফলে (যথা হাঁচলে, বা জোরে কাশলে, বেশি চাপ দিয়ে পায়খানা করলে, খুব ভারী জিনিষ তুললে) এটা হতে পারে। চোখে আঘাত লাগলে বা চোখের অস্ত্রোপচারের পরও এটা হয়। কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। ১০-১৫ দিনের মধ্যে রক্ত নিজে নিজে শোষিত হয়ে যায়। তবে রক্তচাপ মাপা ও রক্ত পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া দরকার কোনো অস্বাভাবিকত্ব আছে কিনা।

স্নান করবার পর, চোখ রগড়ালে চোখ লাল হয়। ভয়ের কিছু নেই, কিছুক্ষণ পর তা চলে যাবে। বাড়ির বাইরে থেকে ঘুরে এসে চোখ পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিলে বাইরের ধুলোবালি, জীবাণু ইত্যাদি সরিয়ে রাখা যায়।

বাড়িতে বা অফিসে কারোর কনজাংটিভাইটিস হলে চোখে হাত দেবার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলুন বা তাঁর ব্যবহৃত কোনো জিনিষ ব্যবহার করবেন না। তাঁকে বলুন চোখে হাত দেবার পর হাত ধুয়ে তবে অন্যকিছু ধরতে। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকাতে কোনো অসুবিধা নেই, ওই ভাবে কনজাংটিভাইটিস কেন, চোখের কোনো রোগই ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

শেষ কথা

সব রক্তচক্ষু কনজাংটিভাইটিস বা জয়বাংলা ভেবে পাড়ার দোকান থেকে কেনা আই-ড্রপ ব্যবহার করে অবহেলা করবেন না— বিশেষ করে যদি সঙ্গে ব্যথা থাকে বা দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়।

তাহলে সাধু সাবধান। বাড়িতে বা অফিসে কারোর কনজাংটিভাইটিস হলে চোখে হাত দেবার আগে ভালো করে হাত ধুয়ে ফেলুন বা তাঁর ব্যবহৃত কোনো জিনিস ব্যবহার করবেন না। তাঁকে বলুন চোখে হাত দেবার পর হাত ধুয়ে তবে অন্যকিছু ধরতে। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকাতে কোনো অসুবিধা নেই, ওই ভাবে কনজাংটিভাইটিস কেন, চোখের কোনো রোগই ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. চন্দন বারি, এম বি বি এস, ডি ও, চক্ষুবিশেষজ্ঞ, একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চক্ষুবিভাগে কর্মরত।

Advt.

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ ও সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার-এর যৌথ উদ্যোগে কেনা হল একটি মোটর চালিত নৌকা।

সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকে রোগী পরিবহন ও মেডিকেল টিমের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হবে এই যানটি।

এই নৌকাটি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন দেশ বিদেশে থাকা শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের বন্ধুরা।

ট্যুরিস্ট সিজনে নৌকাটিকে ভাড়া দিয়ে উপার্জিত অর্থে সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার খরচ চালানো হবে।

কম খরচে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন—

সম্পাদক, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ,

ফোন : ৯৮৩০৯২২১৯৪

মনতোষ মণ্ডল, সম্পাদক, সুন্দরবন কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ সেন্টার, ফোন : ৯৪৭৭৪৯৪৩৯১

স্লিপড্ ডিস্ক— চিকিৎসা

স্লিপড্ ডিস্ক মানেই কি ভয়ঙ্কর ব্যথা, অপারেশন এবং স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে ব্যাহত করা? নাকি অন্য কোনো পথ আছে? লিখছেন— **ডা. সুব্রত গোস্বামী**।

সদ্য মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার সন্দীপ সেন। ঝকঝকে তরুণ, মেডিসিন সাবজেক্টে শহরের উজ্জ্বল এক টুকরো আলো। সকাল বিকাল ব্যস্ততা, অনেকেরই ভরসা। বেশ চলছিল। একবার শীতকালে এক প্রবীণা অসুস্থ হয়ে ভর্তি হলেন দক্ষিণ কলকাতার এক হাস পাতালে— অবস্থা সংকটজনক। ডা. সেন পরপর দু'রাত প্রায় পুরোটাই জেগে সুস্থ করে তুললেন অনেকটাই। তৃতীয় দিন সকালে বাড়ি ফিরে নিচু হয়ে পায়ের মোজা খুলতে গিয়েই ঘটলো বিপদ— হঠাৎ কোমরে একটা তীব্র ব্যথা— তারপর পিঠের নিচের দিকের মাংসপেশিগুলো যেন শক্ত করে কেউ সাঁড়াশি দিয়ে খিমচে ধরলো— সাথে পা দিয়ে নিচের দিক পর্যন্ত তীব্র বিদ্যুতের ঝলক! তীব্র ব্যথায় নট নড়ন চড়ন অবস্থা! সোজা হয়ে দাঁড়ানো-বসা-শোয়া প্রায় অসম্ভব! যন্ত্রণায় চোখ ফেটে জল আসছে— কোনো রকমে ঘরের বিছানায় আস্তে করে শুয়ে পড়লেন ডা. সেন। একটু পাশ ফিরলেও তীব্র ব্যথা! বাড়িতে স্ত্রী, শিশুকন্যা হতভম্ব। স্থানীয় বন্ধু ডাক্তার এসে কড়া ব্যথার ইঞ্জেকশন দিলেন— সাথে অনেক ওষুধ। প্রায় দুদিন পর কোনো রকমে হাঁটার অবস্থা ফিরে এলো— কিন্তু ওষুধ খেয়েও টানা একমাস ভুগলেন ডা. সেন!

অর্থোপেডিক চিকিৎসকের পরামর্শে MRI হল, রিপোর্ট এলো— কোমরের ডিস্ক প্রোলাপ্স— মানে স্লিপড্ ডিস্ক! সিনিয়র নিউরো সার্জেন দেখলেন— বিধান দিলেন অপারেশন করতে হবে। রাজী হলেন না ডা. সেন। কেই বা চায় অপারেশন করাতে!

কেটে গেল কয়েকটা বছর। মাঝে মাঝেই কোমরের ব্যথায় কাহিল হন। প্র্যাকটিস করতে পারেন না আগের মত। একটানা এক ঘন্টার বেশি চেম্বারে বসাও কার্যত অসম্ভব! সরকারি হাসপাতালে কাজ করেন— সেখানেও মাঝে মাঝেই অনিয়মিত যাতায়াত। হঠাৎ নিজেই একদিন নিউরোসার্জেনের কাছে আবার গেলেন— সিনিয়র সার্জেন বললেন— অপারেশনটা করিয়েই নাও উপকার হবে।

অপারেশন ও তারপর

অপারেশন হল। ল্যামিনেকটমি, অনেকটা সাদা সাদা টুকরো টিস্যু বার করা হল শিরদাঁড়া থেকে। একটা শিশিতে তরল পদার্থের মধ্যে ভরে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে তৃপ্ত সার্জেন দেখালেন বাড়ির লোককে। আত্মীয়-স্বজনদের মুখ আনন্দে ভরে উঠলো। অপারেশন সাকসেসফুল!

এরপর তিন মাস কেটে গেছে। প্রায় মাসদুয়েক বিশ্রাম নেবার পর কাজ শুরু করেছেন ডা. সেন। কিন্তু কোমরের ব্যথাটা যেন অনেকটাই মাঝে মাঝে হয়ে চলেছে। নিউরোসার্জেন ধৈর্য ধরতে বলেছেন। মাস, বছর পেরিয়ে গেল— অসহ্য ব্যথা প্রায়ই হানা দেয়। পায়ের ব্যথা একটু কমেছে কিন্তু কোমরের ব্যথা আগের থেকেও তীব্র। নিউরোসার্জেন আর ফোন ধরেন না। একদিন বাড়ির লোককে বলেছিলেন অপারেশন তো ভালোই হয়েছে। ব্যথা তো হবার কারণ নেই— একজন মানসিক রোগের ডাক্তার দেখান!

ডা. সেনের কাছে আস্তে আস্তে পৃথিবীটা ছোটো হতে লাগল। পুরনো রোগীদের মধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো— ডাক্তারবাবু অসুস্থ, মানসিক রোগী! চিকিৎসক বন্ধুমহলে আড়ালে উপহাস— কেউ নাক বেঁকিয়ে বললেন— আগেই বলেছিলাম অপারেশন করার দরকার নেই! শুধুশুধু জোর করে করালো। কেউ বললেন আমাদের সাথে দেখা করবে না, কলেজের পুরনো ছাত্রদের ব্যাচ রিইউনিয়নে আসবে না— ভালো থাকবে কি করে?

বহুক্ষেত্রে অনিয়মিত যাতায়াতে সহকর্মিরাও বিরক্ত। হাবেভাবে প্রকাশও করেন তাঁরা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কড়া ভাষায় তিরস্কার এমনকি চিঠিও ধরালেন— 'কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না' এই বলে।

বাড়ির ঘনিষ্ঠজনেরাও ধীরে ধীরে কার্যত হতাশ হয়ে পড়লেন— গা সওয়া ব্যাপার হয়ে পড়লো সবার কাছেই। ডা. সেন একা ঘরে শুয়ে থাকেন—অন্যদিকে পৃথিবী যেন ভাবলেশহীন! হতাশা, যন্ত্রণা, নিদ্রাহীনতা ক্রমশই বাড়তে থাকে। কাউকে না বলে মুঠো মুঠো ব্যথার ওষুধ খেয়ে চেষ্টা করেন কাজ করবার। ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া শুরু হল— লিভার, পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, কিডনির ধীরে ধীরে ক্ষতি হওয়া— ব্লাড প্রেসার বাড়লো। অ্যাজমা, ডায়াবেটিস, শরীরের ওজন বৃদ্ধি এক এক করে যোগদান করতে লাগলো...

ব্যথা বিশেষজ্ঞের কাছে

পেইন স্পেশালিস্ট তথা ব্যথা বিশেষজ্ঞ দেখলেন।

নতুন রোগের ডায়াগনোসিস করলেন— 'post laminectomy syndrome'— ল্যামিনেকটমি অপারেশনের পরে রোগ সংলক্ষণ। বললেন, ''এখনো অনেক লড়াই করতে হবে। স্লিপড্-ডিস্কে যাঁদের অপারেশন করা হয় তাঁদের প্রায় অর্ধেকের বেশি এই রোগে আক্রান্ত হন— যার কষ্ট অনেক সময় অপারেশনের আগের থেকেও বেশি।''

এই প্রথম একজন কাউকে পেলেন ডা. সেন যিনি বিশ্বাস করছেন ডা. সেনের কষ্টটা মিথ্যা নয়। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পাল্টে যাওয়া, ছোটো হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে অভ্যস্ত ডা. সেন ভাবলেশহীন ভাবেই রইলেন— মুখে এক চিলতে অসহায় হাসি!

কী এই স্লিপড্ ডিস্ক যা এতো মারাত্মক? শাঁখের করাতের মতো যার আচরণ? অপারেশন না করালেও উপায় নেই আবার করালেও বিপদ যখন তখন ধেয়ে আসবে? এই আলোচনায় যেতে গেলে প্রথমে আমাদের মেরুদন্ডের গঠন সম্বন্ধে একটা আলোচনা হওয়া দরকার।

মেরুদন্ডের গঠন

আমাদের মেরুদন্ডে অনেকগুলো কশেরুকা বা vertebra একটার পর একটা ক্যারমের ঘুঁটির মতো সাজানো থাকে। প্রতি দুটি কশেরুকার মাঝখানে থাকে একটা নরম গদির মতো অংশ যার নাম inter vertebral disc বা কশেরুকার প্রতিবেশি চাকতি। এই চাকতিটির ভেতরে থাকে জেলির মতো অংশ বা 'নিউক্লিয়াস পালপোসাস'— ফলে ডিস্কটি কুশনের মতো স্থিতিস্থাপক (elastic) হয় এবং দুটি কশেরুকার মধ্যে চাপটাকে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় করে (অনেকটা মোটর গাড়ির shock absorber বা spring-এর মতো)। এই শিরদাঁড়ার পিছনের দিকেই থাকে সুষুম্নাকান্ড বা spinal cord। আমাদের গলায় সাতটি, বক্ষদেশে বারোটি এবং কোমরের অঞ্চলে পাঁচটি কশেরুকা থাকে এবং প্রতিটি কশেরুকার পরই সুষুম্নাকান্ড থেকে এক জোড়া স্নায়ু বেরিয়ে আসে যা আমাদের স্পর্শ, ব্যথা, ঠান্ডা-গরমের অনুভূতি বা মাংসপেশির সঞ্চালনের উদ্দীপনা বহন করে।

স্লিপড্ ডিস্ক বা মেরুদন্ডের চাকতির স্খলন হলে কী হয়?

আগেই আলোচনা করেছি এই মেরুদন্ডের চাকতি বা ডিস্কের ভেতরে থাকে একটি জেলি জাতীয় অংশ যা anulus fibrosus নামের একটা ফাইবারের বা তন্তুর কৌটোতে ভরা থাকে। কখনো কখনো ঐ বাইরের ফাইবারের কৌটোতে ফাটল ধরলে বা চিড় ধরলে ভেতর থেকে জেলি জাতীয় অংশটা বেরিয়ে আসে ঐ ফাঁক দিয়ে। যদি এই জেলি মেরুদন্ডের পিছন দিকে এসে সুষুম্নাকান্ড বা স্নায়ুতন্তুর সংস্পর্শে আসে তাহলে শুরু হয় প্রদাহ বা inflammation; এই জেলি বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা অনেকটাই গ্রামের দিকে দেখতে পাওয়া সজনে গাছ বা_জিউলী গাছের শক্ত বাকলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা আঠার মতো। তাই এই রোগটা স্লিপড্ ডিস্ক বললে যেমন মনে হয় চাকতিটা সরে এসেছে তা নয়— বরং ডিস্ক ফেটে যাওয়া বলা যায়!

কেন হয়? কাদের হয়?

সাধারণত ৩০ বছরের পর থেকেই এই রোগে

আক্রান্ত হতে দেখা যায়। আসলে ২৫/৩০ বছরের পর থেকেই ছোটাছুটি, খেলাধুলা —এমন সক্রিয় জীবন থেকে সরে এসে প্রায় সকলেই স্থবির-শান্ত জীবন-যাপন করেন। নিয়মিত শরীরচর্চা করা হয় না— অনেক সময় একটানা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে কমপিউটারে কাজ করা, নিয়মিত বিশ্রাম না নেওয়া, এর সাথে স্বাভাবিক নিয়মে বাইরের ফাইবারের খোলসটিও সহজাত তারুণ্য হারিয়ে ফেলে— তারও বয়স বাড়ে— গায়ে ফাটল ধরে— ক্ষয় ধরে।

দাঁড়ানোর তুলনায় বসলে, ঝুঁকে কাজ করলে, ওজন তুললে ডিস্কের ভেতরের জেলিতে অনেক চাপ বেড়ে যায়। ফলে ভেতর থেকে অর্ধতরল এই জেলি তার আবরণের ফাটল দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতেই থাকে যতদিন না ভেতরকার জেলিগুলো তার জলীয় অংশ হারিয়ে নিজেও ক্রমাগত কঠিন হতে থাকে। যাঁরা অতিরিক্ত ওজন তোলেন যেমন চটকলের শ্রমিক, মুটে— এঁদের এই সমস্যার প্রকোপ বেশি। চাষীরা যখন নিচু হয়ে ফসল কাটেন, ধান রোয়ার কাজ করেন তখন এই ধরনের সমস্যা দ্রুত ঘটতে পারে। আজকাল অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে শুধুমাত্র হুজুগের জোরে প্রাণায়াম, পদ্মাসন— হঠাৎ বৃদ্ধ বয়সে এসব করে অনেককেই এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে। ইদানিং সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায় সমস্ত মানুষেরই কম বেশি ডিস্ক প্রোলাপ্স বা স্লিপড্ ডিস্ক-এর সমস্যা আছে— তবে অনেক সময়ই কোনো ব্যথা হয় না, সমস্যা হয় না। এ হল মেরুদন্ডের স্বাভাবিক ক্ষয়রোগ— যেমন আমাদের চুল পাকে, চামড়ায় বলিরেখা দেখা দেয়। তবে আগের বলা ক্ষেত্রগুলিতে এই সমস্যা ত্বরান্বিত হয় মাত্র!

কী সমস্যা বা লক্ষণ হতে পারে?

সাধারণত মাঝে মাঝেই কোমরের ব্যথা, কখনো হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণা। পায়ের আঙুল পর্যন্ত বিদ্যুতের চমকের মতো যন্ত্রণা হতে পারে কারো কারো। অনেক সময় পায়ে অসাড় ভাব হতে পারে, পায়ের জোর কমে যেতে পারে, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাব না করতে পারা, মলদ্বারের আশেপাশে অবশ ভাব হতে পারে কখনো কখনো। সামনে ঝুঁকলে, হাঁচি-কাশি হলে, মাটিতে বসলে এই ব্যথা বেড়ে যায়; বিছানায় শুয়ে পড়লে কমে যায়।

কীভাবে ধরা পড়ে এই রোগ?

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের ইতিহাস, লক্ষণ এবং কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করেই বুঝতে পারেন, আর MRI করে খুব পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় এই সমস্যা। তবে মনে রাখতে হবে যেহেতু প্রায় অধিকাংশ স্বাভাবিক মানুষেরও এই স্লিপড্ ডিস্ক থাকে, তাই MRI করলে রোগীর বা তাঁর দায়িত্বে থাকা চিকিৎসকের অহেতুক আতঙ্ক হতে পারে। NCV বা EMG হল আর দুটো পরীক্ষা যা করে অনেক সময় স্নায়ুর ক্ষতির পরিমাপ করা যায়। মামুলি X-ray তেও দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী

ফাঁক কমে গেছে এমনটা দেখা যায়। তবে আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তাহলে চিকিৎসা কী?

প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশন ছাড়া (conservative পদ্ধতি) সাধারণ চিকিৎসা— যেমন অল্প বিশ্রাম, কম ক্ষতিকর ব্যথার ওষুধ যেমন প্যারাসিটামল, মাংসপেশি শিথিল করার ওষুধ এবং স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা স্তিমিত করার ওষুধ যেমন গাবাপেনটিন, প্রিগাবালিন, অ্যামিট্রিপটিলিন নির্দিষ্ট মাত্রায় দেওয়া হয় (মনে রাখতে হবে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া কখনোই যেন এইসব ওষুধ গ্রহণ না করা হয়)। ব্যথা কিছুটা কমলে নিয়মিত ব্যায়াম, ফিজিওথেরাপি, সাঁতার এসব খুব কার্যকরী হয় এবং এই পদ্ধতিগুলিই চিকিৎসার মূল স্তম্ভ। যদি এসবেও ব্যথার প্রাবল্য অসহনীয় থাকে তবে আধুনিক পেইন ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি— যেমন সুষুম্নাকান্ডে ও ক্ষতিগ্রস্ত স্নায়ুমূলে (nerve root)আধুনিক (C-Arm) যন্ত্রের সাহায্যে প্রদাহ নিবারণকারী বা বেরিয়ে আসা ডিস্কের জেলিকে নিষ্ক্রিয় ও শুকনো করাকে ত্বরান্বিত করে এমন ওষুধ যেমন ওজোন-গ্যাস (O_3) দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। তবে মনে রাখতে হবে প্রতিটি ওষুধই প্রয়োগ করার ক্ষেত্র ভিন্ন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই নির্ধারণ করবেন কোন পদ্ধতিটি দরকারি।

অনেক সময় (যদিও তা খুব কম ক্ষেত্রেই আবশ্যিক) পিঠের শিরদাঁড়া কেটে অপারেশন করে ঐ ডিস্কের বেরিয়ে থাকা অংশ বের করে দেওয়া হয়। সাধারণত রোগীর পায়ের প্রধান পেশিগুলির জোর কমে গেলে, মল-মূত্রত্যাগের সমস্যা থাকলে এই অপারেশন জরুরি হয়ে পড়ে।

আজকাল এন্ডোস্কোপি, মাইক্রোডিস্কেকটমি, নিউক্লিওটমি পদ্ধতিতেও অপারেশন করা হচ্ছে— অপারেশনের পরবর্তী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমাবার জন্য। তবে মনে রাখতে হবে সারা পৃথিবীতেই খুব বাধ্য না হলে অপারেশনের হার দ্রুত কমে আসছে। শুধুমাত্র ব্যথার কারণে অপারেশন করাটাও আজকাল শল্যচিকিৎসকেরা যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না।

স্লিপ ডিস্ক কি আটকানো যায়?

মনে রাখতে হবে স্লিপড্ ডিস্ক হল শরীরের এক ক্ষয়রোগ। আবার অনেক সময় শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথেও এর সম্পর্ক থাকতে পারে। এই সমস্যা আজ যেখানে আছে কাল অন্য জায়গায় হতে পারে। একে কাটাবার ও মোকাবিলা করবার উপায় হল নিয়মিত শরীরচর্চা, উপযুক্ত বিশ্রাম, সুষম খাবার খাওয়া, ধূমপান না করা (দেখা গেছে ধূমপায়ীদের এই রোগ বেশি হয়), সোজা হয়ে বসা যাতে শরীরের ওজন উল্লম্বভাবে শিরদাঁড়ার উপর চাপ দেয়। আর একবার সমস্যা হলে একেবারে সেরে যাবে— এমনটা গ্যারান্টি দিয়ে বলবার কারণ আজ অবধি দেখা যাচ্ছে না।

শল্যচিকিৎসা না অন্য চিকিৎসা— গাইডলাইন?

ইদানিংকালে স্লিপড্ ডিস্কের সমাধানে সারা পৃথিবীতেই শল্যচিকিৎসার পর নানা সমস্যা যেমন 'পোস্ট ল্যামিনেকটমি সিনড্রোম' খুব বেশি দেখা যাচ্ছে। তার একটা কুফল হল এ নিয়ে ডাক্তার-রোগীর মধ্যে অনেক মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই অনেক পাশ্চাত্য দেশেই এ রোগের ধাপে ধাপে চিকিৎসা পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন (protocol) মেনে চলা হয়। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি হয়নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এই গাইডলাইন তৈরি হবে, আর তখন ডাক্তাররা সবাই একই সুরে রোগীকে সৎ-পরামর্শ দিতে পারবেন— এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. সুব্রত গোস্বামী এম বি বি এস, এফ আই পি পি, ব্যথা বিশেষজ্ঞ। একটি সরকারি হাসপাতালে 'পেইন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট'-এর ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

● চিকিৎসা ব্যক্তির অধিকার, সমষ্টির দায়িত্ব

মলদ্বারে রক্তপাত

মলদ্বার দিয়ে রক্ত বেরোলে অনেকে লজ্জায় রোগ প্রকাশ করতে চান না। আবার অনেকে অপারেশনের ভয়ে বিকল্প চিকিৎসা থেকে তাগা-তাবিজ-গ্রহরত্নের দিকে ছোটেন। অথচ সময়ে ডাক্তারের কাছে গেলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসায় সব কিছুরই আরোগ্য বা উপশম সম্ভব— লিখছেন **ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী** ও **ডা. সুজয় বালা**।

একটা ঘটনার কথা এই লেখাটা লেখবার সময় বারবার মনে পড়ছিল। বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর মামাবাড়ি গিয়েছিলাম। সন্ধ্যের সময় বড়মামা অফিস থেকে ফিরলে লক্ষ্য করলাম তাঁর গম্ভীর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। এর খানিকক্ষণ পর কারণটা আবিষ্কার করে উঠতে পারলাম। বাবার সাথে বসে বড়মামা খুব কাঁচুমাচু মুখে যা আলোচনা করছিলেন তাঁর মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, আজ সকালে পায়খানা করার সময় পায়খানার সাথে প্রচুর রক্ত বেরিয়েছে। অফিসের বন্ধুদের সাথেও বিষয়টা নিয়ে বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে ও অনেকেই নাকি ডাক্তারের কাছে যাওয়া ও 'কাটাছেঁড়া' করা অর্থাৎ অপারেশন করানোর নিদান দিয়েছেন। কিছু লোকজন অবশ্য চাঁদসী ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সাফল্যের কাহিনীও শুনিয়েছেন। তা মোদ্দা কথা হল গিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত কেউ না কেউ এই ধরনের সমস্যায় ভোগেন। অর্থাৎ এ হল মোটামুটি আমাদের 'ঘর ঘর কি কহানী'।

রক্তপাত কয় প্রকার ও কী কী?

বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয় ধরতে পারেন নি যে উপরোক্ত শব্দবন্ধটি একটি জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা থেকে ধার করা! রক্তপাত বলতে সাধারণভাবে আমরা লাল রঙের রক্তের কথাই বুঝি। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টা একটু আলাদা।

১. কালো পায়খানা (Malena)—

চটচটে কালো পিচের মতো পায়খানা যা জল দিলে অনেক সময় লাল হয়ে যায়। এটাও এক ধরনের রক্তপাতের সংকেত। এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ হয় পৌষ্টিক নালীর উপরের দিকের কোনো অংশ থেকে, যা কালক্রমে পায়খানার সাথে একটু পরিবর্তিত রূপে বেরিয়ে আসে। অল্প রক্তপাত হলে সেটা সুনির্দিষ্টভাবে ধরতে গেলে পায়খানার পরীক্ষা করতে হয়। এই ধরনের রক্তপাতের বহু কারণ রয়েছে, যা অন্য কোনো দিন আলোচনায় আনা যেতে পারে। মোদ্দা কথাটা হল এ ক্ষেত্রেও দেরি না করে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই উচিত।

২. লাল রক্ত

এক্ষেত্রে পায়খানার দ্বারের কাছাকাছি অন্ত্রের কোনো অংশ থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এই ধরনের রক্তপাতের সময় অনেক সময় পায়খানা করার সময় প্রচন্ড যন্ত্রণা হতে পারে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনোরকম যন্ত্রণা ছাড়াও রক্তপাত হতে পারে।

পায়খানা করার সময় যন্ত্রণা ও সঙ্গে রক্তপাত

সাধারণভাবে যে কারণে এই উপসর্গগুলি হয় তা হল—

(ক) চেরা ঘা বা ফিসার (Anal fissure)

এক্ষেত্রে যন্ত্রণা এত তীব্র হতে পারে যে রোগীর পায়খানা করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই রোগের ক্ষেত্রে পায়খানার দ্বারের সামান্য উপরের মলনালী চিরে ঘা বা ক্ষত তৈরি হয়েছে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই রোগ বেশি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হয়তো রোগী প্রথমবার এই সমস্যায় পড়ে ডাক্তারবাবুর কাছে এলেন অথবা তাঁর সমস্যা বহুদিনের; মাঝে মাঝে ব্যথাটা প্রচন্ড বেড়ে যায়, সঙ্গে রক্তও পড়ে— তখন কোনোভাবে ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে সামাল দেন। এখন রক্ত বেশি পড়ছে তাই ডাক্তারবাবুর কাছে আসা।

(খ) সংক্রমণ-জনিত কারণে পায়খানার রাস্তার কাছে ফোঁড়া

এক্ষেত্রে পায়খানার রাস্তার চারপাশে দপ দপ করে ব্যথা হয়, সঙ্গে জ্বরও হতে পারে। পায়খানার রাস্তার ভিতরে ফোঁড়ার মুখ থাকে— যা থেকে পায়খানার রাস্তার ভিতরেই পুঁজ ও রক্ত বের হয়। সেটা পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

(গ) ভগন্দর বা ফিসচুলা (Anal fistula)

এক্ষেত্রে দেখা যায় যে পায়খানার দ্বারের পাশে একটি ছোট্ট ফুসকুড়ি হয়েছে যা থেকে ক্রমাগত রস ও সামান্য রক্ত বের হচ্ছে, যাতে রোগীর অন্তর্বাস ভিজে যাচ্ছে। এই ছোট্ট ফুসকুড়ি অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ নেই, কারণ আপাতদৃষ্টিতে একে ছোট্ট মনে হলেও এটি আসলে একটি লম্বা নালীর বাইরের মুখ যার অন্যমুখ রয়েছে পায়খানার দ্বারের ভিতরে পায়খানার দ্বার সংলগ্ন মলনালীর ভেতরের দেওয়ালের কোনো অংশে। একে অবহেলা করলে এতে বার বার সংক্রমণ হবে ও সংক্রমণ ছড়িয়ে নতুন নতুন লম্বা নালীও তৈরি হতে পারে, যার চিকিৎসা করা অত্যন্ত জটিল। ডায়াবেটিস রোগাক্রান্ত, কোনো কারণে দীর্ঘদিন স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ খাচ্ছেন বা অন্য কোনো জটিল রোগের কারণে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়েছে— তাঁদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

যন্ত্রণা ছাড়া রক্তপাত

অর্শ বা পাইলস (Piles বা Hemorroids) — এক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো ব্যথা যন্ত্রণা থাকে না। পায়খানা করার সময় লাল রক্ত পায়খানার

গায়ে লেগে থাকে। পায়খানা করার সময় টপ টপ করে রক্তপাতও হতে পারে। এটা হয় মূলত পায়খানার দ্বারের সংলগ্ন মলদ্বারের গায়ের শিরা ফুলে ও ছিঁড়ে গিয়ে। বহুদিন চিকিৎসা না করিয়ে ফেলে রাখলে, সংক্রমণ ঘটার কারণে অনেক সময় ব্যথা হতে পারে।

টিউমার (Tumour)— পায়খানার দ্বার সন্নিহিত মলনালীতে কোনো টিউমার থাকার কারণেও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়ে। এক্ষেত্রে মল সরু হয়ে পায়খানার দ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসে। এমনকি পায়খানা আটকেও যেতে পারে। পায়খানা ভালো না হওয়ার কারণে রোগী অনেক সময়ই পায়খানা হওয়ার ওষুধ খায়। এই ওষুধ খাওয়ার ফলে সকালে হঠাৎ পায়খানার চাপ আসতে পারে যাতে শুধুমাত্র হাওয়া ও শ্লেষ্মা জাতীয় পদার্থ বের হয়। এর সাথে রক্তও বের হতে পারে। এই টিউমার সাধারণ নিরীহ টিউমার বা ক্যানসার— দুই-ই হতে পারে।

ছোটোদের ক্ষেত্রে পায়খানার দ্বার দিয়ে রক্তপাত সাধারণত Rectal Polyp অর্থাৎ পায়খানার দ্বার সংলগ্ন মলনালীতে মাংসপিন্ডের কারণে হয়। এক্ষেত্রে রক্ত পায়খানার সাথে লেগে থাকে ও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগ নির্ণয়ের জন্য কোনো দামী পরীক্ষা লাগে না। চিকিৎসক রোগীর পায়খানার দ্বার দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে (Digital Rectal Examination) ও Proctoscope নামক অতি সাধারণ ফানেল আকৃতির যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে পায়খানার দ্বারের ভিতরের অংশ পর্যবেক্ষণ করেই রোগ নির্ণয় করে ফেলেন। যদি উপরোক্ত পরীক্ষায় কোনো রোগ ধরা না পড়ে সেক্ষেত্রে কোলোনোস্কোপি (Colonoscopy) করতে হয়। প্রক্টোস্কোপি করে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, কোলোনোস্কোপি করে করে চিকিৎসক তার চাইতে বেশিদূর দেখতে পান।

চিকিৎসা

কারণ বিশেষে রোগের চিকিৎসাও বিভিন্ন রকমের হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ চিকিৎসা মেনে চলা হয়।

(ক) প্রচুর শাক-সব্জি (High Fibre Diet) খেতে হবে।

(খ) প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে।

১. চেরা ঘা (Anal fissure)— এর চিকিৎসা মূলত ওষুধ দিয়েই করা হয়।

(ক) Lignocain gel-এর সাথে Diltiazem, Nifedipine জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে পায়খানার দ্বারের ভিতরে যেখানে ব্যথা রয়েছে সেখানে লাগাতে হবে। বাইরে লাগিয়ে লাভ নেই। পায়খানার আগে, ঘুমোবার আগে ও সব মিলিয়ে দিনে ৩-৪ বার এই ওষুধ লাগাতে হবে।

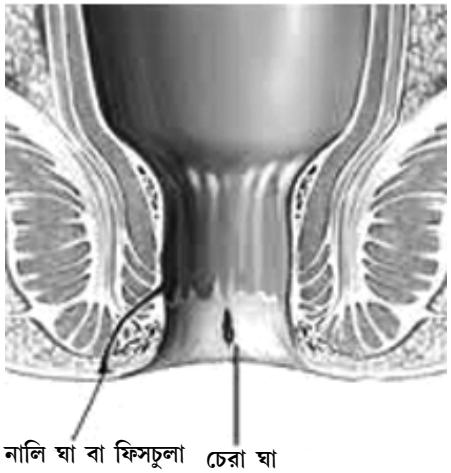

নালি ঘা বা ফিসচুলা চেরা ঘা

(খ) পায়খানা নরম করার ওষুধ (Laxative) খেতে হবে। যেমন Lactulose, Parafine ইত্যাদি।

(গ) একটি গামলায় সহ্য করার মতো গরম জলে পশ্চাতদেশ অর্থাৎ পায়খানার দ্বার ডুবিয়ে দিনে ২-৩ বার ১০ মিনিট করে বসলে আরাম পাওয়া যায়।

এসবের দ্বারা সাধারণত ১ সপ্তাহের মধ্যে ব্যথা কমে যায়। ব্যথা না কমলে বুঝতে হবে রোগটি বহুদিন ধরেই রয়েছে ও এখন বাড়াবাড়ি হয়েছে (Acute on chronic)। এক্ষেত্রে অপারেশনের দ্বারা পায়খানার রাস্তা বড় করতে হয়।

২. সংক্রমণ জনিত কারণে পায়খানার রাস্তায় ফোঁড়া (Abcess)

এক্ষেত্রে ছোট অপারেশনের দ্বারা জায়গাটি কেটে পূঁজ বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা (Incision and Drainage) করা হয়। এর সাথে অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হয়।

৩. নালি ঘা বা ফিসচুলা (Anal Fistula)

এক্ষেত্রে একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন। দীর্ঘদিন রোগ পুষে রাখলে তা জটিল আকার ধারণ করে। ফলে অপারেশন করলেও রোগটি আবার হতে পারে। রোগ খুব জটিল হলে অনেক সময়ই কিছু দিনের জন্য পেটের চামড়ার মধ্যে ফুটো করে তার সঙ্গে বৃহদন্ত্রের অংশ জুড়ে সেখান দিয়ে মল বের করার ব্যবস্থা করা হয়। একে বলে সাময়িক কোলোস্টমি (Temporary Colostomy)।

অর্শ বা পাইলস (Piles বা Hemorroids)

এক্ষেত্রেও মূল চিকিৎসা অপারেশন। কোনো ওষুধ দিয়ে, মলম দিয়ে রোগ সারানো যায় না। পায়খানা নরম করার ওষুধ দিলে রক্ত কম পড়বে। কিন্তু অপারেশন করতেই হবে।

৫. ছোটদের ক্ষেত্রে যে কারণে বেশিরভাগ সময় পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত পড়ে, সেই পলিপ (Rectal Polyp)-এর একমাত্র চিকিৎসা হল অপারেশন করে মাংসপিন্ডটি বাদ দেওয়া।

৬. ক্যানসার

এর চিকিৎসা হিসেবে অপারেশন, রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি লাগতে পারে। সময় মতো চিকিৎসা করলে এই ক্যানসার সেরে যায়। কিন্তু ফেলে রাখলে বিপদ।

শেষ কথা

পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপাতের কারণ হিসেবে যে রোগগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব কারণগুলিই পাওয়া যায়। এছাড়াও কিছু বিরল বা কম পাওয়া যায় এমন রোগেও রক্তপাত হতে পারে। কারণটা কী সেটা ডাক্তারবাবুই সবচেয়ে ভালো বুঝবেন ও সেই মতো চিকিৎসাও হবে।

চাঁদসী, কোয়াক ডাক্তারের কাছে গেলে তাঁরা রোগ সারিয়ে দেওয়ার দাবী করলেও আদতে তা

- মলদ্বার দিয়ে লাল রক্ত পড়ার প্রধান কারণ পাইলস, ফিসার, ফিসচুলা, ফোঁড়া ও টিউমার। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যথাহীন রক্তপাতের প্রধান কারণ রেক্টাল পলিপ।
- প্রথম অবস্থাতেই ডাক্তারের কাছে গেলে এর প্রায় সবগুলোই সারে।
- দেরি হলে বিপদ— মলদ্বারের পেশি নষ্ট হয়ে গিয়ে মল ধারণ করার ক্ষমতা লোপও পেতে পারে।

হয় না। উল্টে রোগী যখন অপারেশনের জন্য ডাক্তারবাবুর কাছে যান ততক্ষণে রোগ জটিল হয়ে যায়, সংক্রমণও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফল হয় মারাত্মক। যাঁরা অপারেশন এড়াবার আশায় বিভিন্ন 'বিকল্প চিকিৎসাপদ্ধতি'— হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, হেকিমি— ইত্যাদির কাছে ছোটেন তাঁদের বলব; জেনে রাখুন একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ডাক্তারিতেই (লোকমুখে যা অ্যালোপ্যাথি বলে পরিচিত) বিভিন্ন নিরাময় পদ্ধতির (ওষুধ ও অপারেশন) রোগ সারানোর ক্ষমতা কতটা সেটা নিরপেক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করলে পায়খানা ধরে রাখার যে মাংসপেশি পায়খানার দ্বারের সামান্য ভিতরের দিকে রয়েছে তা রোগের কবলে পড়ে কার্যক্ষমতা হারায়। ফল— রোগী আর কোনোভাবেই পায়খানা ধরে রাখতে পারেন না (Permanent Incontinence)। যেখানে সাবধানতা ও সচেতনতা অবলম্বন করলে অচিরেই সুস্থ জীবনে ফেরা যায় সেখানে শুধুমাত্র অবহেলার কারণে জীবন হয়ে উঠতে পারে দুর্বিষহ।

লেখক পরিচিতিঃ ডা. অর্কজ্যোতি মুখার্জী কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
ডা. সুজয় বালা, এম বি বি এস, এম এস, বর্তমানে ক্যানসার সাজারিতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন।

কুইজ

'আমার হার্ট, লিভার, ফুসফুস, কিডনি আছে'— একথা কেউ বলে না কিন্তু 'আমার থাইরয়েড আছে'— এই কথাটা প্রায়ই অনেক লোকের মুখে শোনা যায়। অথচ থাইরয়েড নামক গ্রন্থিটি গলার নিচের দিকে ঠিক মাঝখানে তরুণাস্থির উপরে সব মানুষের থাকে। অনেকটা প্রজাপতি আকারের এই গ্রন্থি সামান্য স্ফীত হলেই ঢোঁক গেলার সময় গলার সামনে ওঠা-নামা করতে দেখা যায়, অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থায়ও দেখা যায়। থাইরয়েড হরমোনের বেশি বা কম ক্ষরণ অনেক গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি করে— এই সব নিয়ে মানুষের মনের বিভ্রান্তি কিছুটা দূর করার উদ্দেশ্যে এবারের কুইজ শুধু থাইরয়েড নিয়ে।

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস**। বর্তমানে এম বি বি এস পাঠরত।

১। স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্কের থাইরয়েডের ওজন কত?

২। রক্তে কী কী থাইরয়েড হরমোন পাওয়া যায়?

৩। কোন মৌল থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য আবশ্যিক?

৪। মস্তিষ্কের পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখভাগ থেকে নিঃসৃত কোন হরমোন থাইরয়েডকে নিয়ন্ত্রণ করে?

৫। শৈশবে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে যে ধরনের খর্বাকৃতি হয় তাকে কি বলে?

৬। পূর্ণবয়স্কের থাইরয়েড হরমোন ঘাটতি হলে ওজন বেড়ে যায়, কাজকর্মে উৎসাহ কমে, বেশি ঘুম পায়, ভুলে যাওয়ার সমস্যা বাড়ে, মাথার চুল উঠে যায়, মহিলাদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত হয়। এই সব লক্ষণকে মিলিতভাবে কি বলে?

৭। থাইরয়েড গ্রন্থিতে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন থাকে যা হরমোন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজন— এর নাম কী?

৮। থাইরয়েড গ্রন্থির কোষথলির (ফলিকল) মাঝে মাঝে আরেক ধরনের কোষ দেখা যায়— এই কোষের নাম কি? এই কোষ থেকে আরেক ধরনের হরমোন বেরোয় যা রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই হরমোনের নাম কী?

৯। থাইরয়েডে কোন ধরনের ক্যানসার সবচেয়ে কম দেখা যায়, কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক?

১০। থাইরয়েডে কোন ধরনের ক্যানসার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কিন্তু ঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে সবচেয়ে কম প্রাণহানিকর?

১১। জ্বর, সর্দিকাশি ইত্যাদি লক্ষণের সঙ্গে অনেক সময় থাইরয়েড গ্রন্থিতে সাময়িক ব্যথা দেখা যায়— এটি ভাইরাসজনিত থাইরয়েডের প্রদাহ। এই সমস্যার আর একটা নাম কী?

১২। থাইরয়েড হরমোন বেশিমাত্রায় নিঃসৃত হলে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা যায়, যেমন ওজন কমে যাওয়া, নাড়ির গতি দ্রুত হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, রক্তচাপ বাড়া, বেশি খিদে পাওয়া, ইত্যাদি। মিলিতভাবে এই লক্ষণগুলোকে কী বলে?

১৩। গ্রেভস ডিজিজ নামে থাইরয়েডের অসুখে প্রধান কোন তিনটে লক্ষণ দেখা যায়?

১৪। বাঁধাকপি ইত্যাদি গলগন্ড সহায়ক খাদ্যে যে যৌগ থাকে তা থাইরয়েড গ্রন্থিতে আয়োডাইড (থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষে আবশ্যিক) ঢুকতে বাধা দেয়। যৌগগুলো কী কী?

১৫। গলগন্ড ও থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতিকারক কয়েকটি ওষুধের নাম কী?

১৬। থাইরয়েডের গন্ডগোলে অনেক সময় মনে হয় চোখ ঠিকরে কোটরের বাইরে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তারি পরিভাষায় এই অবস্থাকে কী বলে?

—উত্তর ৩৭ পাতায়

With Best Compliments

from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, Kalindi Housing Estate
Kolkata- 700089

গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। সংক্ষেপে USG। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক অতি পরিচিত প্রযুক্তি। সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য চিকিৎসকেরা হামেশাই এই বিশেষ পরীক্ষাটি করতে বলেন। কিন্তু কেন? এই পরীক্ষা কি সম্পূর্ণ নিরাপদ? আজকাল স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা এর উপর কেন এত নির্ভরশীল। এইসব প্রসঙ্গেই আলোচনা করছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**।

প্রথমেই জেনে নিই এর প্রযুক্তিগত দিকটা। আল্ট্রাসাউন্ড বা শব্দোত্তর তরঙ্গ মানে অধিক কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ যা মানুষের কানে ধরা পড়ে না। কিন্তু বিশেষ যন্ত্রের প্রয়োগে এই শব্দতরঙ্গের সাহায্যে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গের ছবি তৈরি করা সম্ভব। এই প্রযুক্তির সাহায্যে গর্ভস্থ ভ্রূণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশদ ধারণা পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ গঠনগত সমস্যা এর মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রশ্ন উঠতেই পারে গর্ভাবস্থায় ইউ এস জি-র নিরাপত্তা নিয়ে। পঞ্চাশের দশক থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে। এখনো পর্যন্ত এর কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) ধরা পড়ে নি। এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা আছে। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এর ব্যবহার সমর্থন করা যায় না।

আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ইতিহাস

আল্ট্রাসাউন্ড তথা শব্দোত্তর তরঙ্গ সম্পর্কে প্রথম ধারণা পাওয়া যায় ইতালির বৈজ্ঞানিক Lazzaro Spallanzani-এর কাছ থেকে ১৭৯০ সালে। বাদুড়েরা কিভাবে দিক নির্ণয় করে সেটা খুঁজতে গিয়ে তিনিই প্রথম শব্দোত্তর তরঙ্গের বর্ণনা দেন। এরপর নানা রকমভাবে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার হয়েছে। যেমন বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ ডুবে যাবার পর Paul Langvin একটি যন্ত্রের আবিষ্কার করেন যার নাম Hydrophone, যা দিয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রয়োগে জলের তলায় হিমশৈল (iceberg) আছে কিনা বোঝা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইয়ান ডোনাল্ড নামে একজন স্কটিশ ডাক্তার সেনাবাহিনীতে কাজ করতে গিয়ে রাডার, সোলার ইত্যাদি বিষয়ে আকর্ষিত হয়ে পড়েন। ডা. ইয়ান ডোনাল্ড চিকিৎসাশাস্ত্রে শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রথম সফল ব্যবহার করেন।

এবার দেখে নি গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কি কি কাজে লাগতে পারে।

১. গর্ভসঞ্চার হয়েছে তা সুনিশ্চিতভাবে জানা ঃ উন্নত মেশিনে গর্ভাবস্থার পাঁচ/ছয় সপ্তাহের মধ্যেই জরায়ুর ভিতর (gestation sac) বা ভ্রূণথলি দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়েই বলে দেওয়া সম্ভব ভ্রূণের সংস্থাপন জরায়ুর ভিতরে হয়েছে না বাইরে। বাইরে হলে যে মায়ের জীবন সংশয়! যাকে বলে ectopic pregnancy। এছাড়াও ভ্রূণের সংখ্যাও এ সময় বলে ফেলা সম্ভব। গর্ভে একাধিক ভ্রূণ থাকলে চিকিৎসার সুবিধার্থে তা দ্রুত জেনে নেওয়াই ভালো।

২. গর্ভকাল নির্ণয় (determination of gestational age) ঃ ভ্রূণের মাপ নিয়ে আমরা ভ্রূণের বয়স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসে মাথা থেকে দেহকান্ড-শেষ (rump) অবধি মাপ (crown rump length) নেওয়া হয়। তারপর বাচ্চার মাথার মাপ, কোমরের মাপ এবং ফিমার বোনের মাপ থেকে বাচ্চার সম্ভাব্য বয়সও বলা যায়। এভাবেই ডেলিভারির সম্ভাব্য সময় বোঝা যায়। তৎকালীন ওজন সম্পর্কেও সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

৩. ভ্রূণের গঠনগত বিকৃতি নির্ণয় (diagnosis of fetal malformation) ঃ ইউ এস জি (USG)-র সাহায্যে গর্ভস্থ শিশুর অনেক গঠনগত সমস্যাই নিশ্চিতভাবে ডায়গনোসিস করা যায়। শুধু তাই নয় ২০ সপ্তাহের আগেই অধিকাংশ সমস্যা চিহ্নিত করে ফেলা সম্ভব। এই ২০ সপ্তাহ সময়সীমাটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমস্যাটি ভীষণ গভীর হলে গর্ভপাত করানোর একটা সুযোগ থাকে। আমাদের দেশে আইনত ২০ সপ্তাহের পর আর কোনো ভাবেই গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করা যায় না।

গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফির নিরাপত্তা কতটা?

Royal College of Obstreticians & Gynaecologists ১৯৯৭ সালে তাঁদের guideline-এ বলেন USG-র কোনো নির্দিষ্ট পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এর ব্যবহার সমর্থন করা যায় না। একটি 'সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমালোচনা' (systematic review) গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফির নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে (NHS 2009)। এই রিভিউ-এ মা ও বাচ্চা দুজনের উপর আল্ট্রাসোনোগ্রাফির কোনো ক্ষতিকারক প্রভাব আছে কিনা তা দেখা হয়। বাচ্চার ওজন কম হচ্ছে কিনা, তার স্নায়বিক কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সবশেষে এই সিদ্ধান্ত আসে যে গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একেবারে নিরাপদ।

ভ্রূণের কোন কোন রোগ গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দিয়ে ধরা যায়?

এবার দেখে নেওয়া যাক গর্ভস্থ ভ্রূণের কি কি রোগ আল্ট্রাসোনোগ্রাফির প্রয়োগে চিহ্নিত করা যায়। এর সংখ্যা অনেক। প্রথমে শুরু করি মাথা ও তার অন্তর্বর্তী অংশ দিয়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভ্রূণের করোটির হাড়গুলি (skull) তৈরি হতে পারে না, একে বলা হয় অ্যানেনকেফালি (anencephaly)। বা ধরুন মগজের মধ্যে অতিরিক্ত জল জমে যাওয়া, যার ডাক্তারি পরিভাষা হাইড্রোকেফালাস (hydrocephalus)— এসবই দেখা যেতে পারে গর্ভাবস্থায় USG দিয়ে।

এবার আসি আমাদের মেরুদন্ডের রোগে। অনেক সময় মেরুদন্ডের মধ্যেকার অস্থিপরিবেষ্টিত নালি (vertebral canal)-তে ফাঁক থাকে বা তা পুরোপুরি তৈরি হয় না এবং সেই জায়গায় সুষুম্নাকান্ড (spinal cord) অরক্ষিত থাকে। এর ফলে বাচ্চার হাত পা নাড়াতে বা মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধা হয়। সময় মতো ধরা পড়লে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট করানো যেতে পারে, কারণ এসব রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য দেবার মতো চিকিৎসা এখনো আসে নি।

শিরদাঁড়া অর্থাৎ পিঠের দিকে যেমন ফাঁক থাকা সম্ভব ঠিক তেমনি পেটের দিকেও ফাঁক থাকতে পারে। সাধারণত নাভির আশেপাশে এই সমস্যা দেখা দেয় এবং এই ফাঁক দিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্র বেরিয়ে আসতে পারে। এর জন্য দুধরনের রোগ হতে পারে। একটির নাম umbilical hernia বা omphalocle। অন্যটির নাম gastroschsis। এ সবগুলোই ভ্রূণ অবস্থায় USG দিয়ে ধরা সম্ভব।

এবার বলি হৃৎপিন্ড বা তার আশপাশের রোগের সমস্যার কথা। নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন অমুক বাচ্চার হার্টে ফুটো আছে, তমুক বাচ্চা কাঁদতে গেলে নীল হয়ে যায় ইত্যাদি। আমাদের শরীরে হৃৎপিন্ড অত্যন্ত জটিল এক যন্ত্র। এর থেকে উদ্ভূত সমস্যাও গুণে শেষ করা যাবে না। তবে সমস্যাগুলির অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ গর্ভাবস্থার পাঁচ মাস নাগাদ নির্ণয় করা সম্ভব। এর জন্য অবশ্যই প্রয়োজন উন্নতমানের ইউ এস জি মেশিন এবং দক্ষ পরীক্ষক।

নিশ্চয় অনেক মানুষ দেখেছেন যাদের হাত-পা ছোটো ছোটো কিন্তু মাথার মাপ স্বাভাবিক। এই রোগকে চলতি কথায় অ্যাকন্ড্রোপ্লাসিক বামনত্ব বলা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই জন্মের আগে এই রোগ ধরে ফেলা সম্ভব। বাচ্চার গঠনগত সমস্যা যেগুলি কিনা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে নির্ণয় করা যায় তার তালিকা বানাতে গেলে মহাভারতের সামিল হয়ে যাবে। তাই দেখে নিই জিনঘটিত কি কি রোগে ইউ এস জি আমাদের সাহায্য করতে পারে। এর তালিকাও সুদীর্ঘ। আমরা শুধু তুলনায় সহজপ্রাপ্য রোগগুলির কথা বলব। থ্যালাসেমিয়া রোগের নাম শুনে থাকবেন নিশ্চয়। এই রোগে বাচ্চা প্রচন্ড রক্তাল্পতায় ভোগে। ঘন ঘন রক্ত সঞ্চালন করতে হয়। গর্ভাবস্থার তিন মাস নাগাদ প্লাসেন্টা (চলতি বাংলা গর্ভফুল বা শুধু ফুল) থেকে সামান্য অংশ নিয়ে পরীক্ষা করলে থ্যালাসেমিয়া রোগ ধরে ফেলা সম্ভব। এই পরীক্ষার নাম chorionic villus sampling, সংক্ষেপে CVS (সি ভি এস)। আর এই সি ভি এস পরীক্ষা করতে গেলে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্য নেওয়া আবশ্যিক। আর একটি রক্ত-সংক্রান্ত রোগের কথা বলব যার নাম হিমোফিলিয়া। এই বংশগত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত জমাট বাঁধে না। সি ভি এস পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগও নির্ণয় সম্ভব। আর একটি বহুলপ্রাপ্য রোগের কথা বলি যে রোগে বাচ্চার পেশিগুলি খুব দুর্বল হয়। এর পোশাকি নাম Duchenne Muscular Dystrophy—

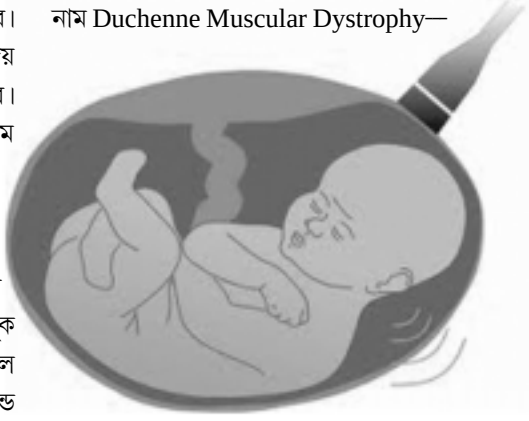

সংক্ষেপে DMD। এই রোগেরও কোনো প্রতিকার নেই। সময় মতো ধরা পড়লে গর্ভপাত করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

এবার একটি ক্রোমোজমঘটিত রোগের কথা বলি। নাম ডাউনস সিনড্রোম। বিশ্বব্যাপী প্রতি ৭০০ জনের মধ্যে একজন জন্ম নেন ডাউনস সিনড্রোম নিয়ে। এতে বাচ্চার বুদ্ধি কম হয় ও শারীরিক-মানসিক পরিপক্কতা লাভে দেরি হয়—পুরো পরিপক্কতা হয় না। এছাড়া বাচ্চার হৃৎপিন্ড, পাকস্থলি ইত্যাদি যন্ত্রে নানা রকম সমস্যা থাকতে পারে। বাচ্চার মুখমন্ডলও অন্যরকম দেখতে হয়। গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ডাউনস সিনড্রোম আছে কি নেই তা বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলে দেওয়া সম্ভব সি ভি এস অথবা অ্যামনিওসেন্টেসিস (amniocentesis) পরীক্ষার মাধ্যমে। দ্বিতীয় পদ্ধতির কথা এখনো বলা হয়নি। এর মারফৎ বাচ্চার চারপাশে যে জল থাকে তা সামান্য পরিমাণে বের করে নেওয়া হয়। সি ভি এস বা অ্যামিনিওসেন্টেসিস যাই করুন না কেন অবশ্যই দরকার হয় ইউ এস জি-র।

সুস্থ ভ্রূণের জন্য ইউ এস জি

অনেকক্ষণ গর্ভস্থ ভ্রূণের রোগ নির্ণয়ের কথা বললাম। এবার ধরে নিই বাচ্চার কোনো রোগ নেই। সেক্ষেত্রে কি ইউ এস জি কোনো কাজে আসে না? নিশ্চয়ই আসে। ভ্রূণের স্বাস্থ্য নির্ধারণের জন্য তার চারপাশের জলের পরিমাণ, মায়ের থেকে বাচ্চার শরীরে কি রকম রক্ত সঞ্চালিত হচ্ছে, এগুলি জানা প্রয়োজন। আর এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় ইউ এস জি-র প্রয়োগে। এছাড়া বাচ্চার তৎকালীন ওজনও অনুমান করা যায়। গর্ভাবস্থায় এসব জানা থাকলে জন্মের পর বাচ্চার কি ধরনের চিকিৎসা লাগতে পারে তার পরিকল্পনা করা সম্ভব।

তাহলে কি ইউ এস জি-র সবই ভালো?

এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম গর্ভাবস্থায় ইউ এস জি-র ইতিহাস, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও নানা বিষয়ে এর প্রয়োগ সম্পর্কে। অর্থাৎ এর সুবিধা নিয়েই সব কথা বলেছি। তার মানে কি এর কোনো অসুবিধা নেই? আমার মতে এর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল ভুল রোগনির্ণয়। সব ডাক্তারি পরীক্ষারই কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মি বা ডাক্তার ছাড়া এই প্রযুক্তির ব্যবহার একেবারেই সমর্থন করা যায় না।

আর একটি সমস্যা আমাদের দেশে বিশেষভাবে দেখা যায়। সেটি হল কন্যাভ্রূণ হত্যা। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ভারতবর্ষে আইনত দন্ডনীয়। কন্যাভ্রূণ হত্যার সাথে যারা যুক্ত তাদের প্রতি লেখকের জমা রইল ঘৃণা।

আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একটি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যথাহীন এবং নিরাপদ রোগনির্ণয় পদ্ধতি। সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে ভ্রূণের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এর মাধ্যমে জানা সম্ভব। বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে এই প্রযুক্তিরও দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। 3D ও 4D মেশিনের সাহায্যে ভ্রূণের আরও ভালো ছবি পাওয়া যাচ্ছে। গর্ভাবস্থায় শিশুর রোগ নির্ধারণের পাশাপাশি তার রোগ নিরাময়েও অনেক উন্নতি হচ্ছে। আমাদের দেশে এই সব সুযোগ সুবিধা এখনো সাধারণ লোকের হাতের বাইরে। তবে আগামী দিনে গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবহার আরও অনেক বাড়বে।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের স্বাস্থ্য নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত।

কেউটে

সাপের কামড়ে এদেশে মানুষ মরে, আর কিন্তু নির্বিষ সাপের কামড়ে আতঙ্কেও মানুষ মরে যেতে পারে। ভয়ানক বিষধর সাপ কেউটে চিনবেন কেমন করে, আর সেই সাপ কামড়ালে কী করবেন আর কী করবেন না— জানাচ্ছেন **ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার**।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত যে বিষধর সাপগুলি আছে, যাদের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হয়, সেগুলি হল—
১। কেউটে এবং গোখরো (Cobra)
২। কালাচ (Crait)
৩। চন্দ্রবোড়া (Russels' viper)

আগের সংখ্যায় চন্দ্রবোড়া নিয়ে আলোচনা করেছি, এই সংখ্যায় আলোচিত হবে কেউটে সাপ সম্বন্ধে।

কেমন দেখতে?

কেউটে প্রায় ৭-৮ ফুট লম্বা; জন্মের সময় মাত্র ২-৩ সেমি লম্বা থাকে। নানা রঙের দেখতে— কালো, ঘন বাদামী অথবা হালকা হলুদ। মাথা এবং গলা বেশ বড় হয়। চোখ বড় এবং কালো। গায়ে মসৃণ আঁশ (scale) থাকে। শরীরের বিশেষ দুটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

১। গলার নিচে (ছবি ১) বড় চওড়া কালো দাগ (band) থাকে।

২। ফনা (hood)— ভয় দেখালে বা তাড়া করলে এরা ফনা তুলে দাঁড়ায়। এদের গলায় লম্বা কতকগুলি পাঁজরের মতো হাড় থাকে (ribs); সেগুলি ছোট-বড় করতে পারে। গলাতে খানিকটা ঢিলা চামড়া থাকে, সেটিকে বড় করতে পারে। গলার চামড়া এবং হাড়গুলিকে লম্বা করে ফনা তৈরি করে। ফনার মাথায় দুটি বৃত্ত থাকে; এই দুটি বৃত্ত একটি আঁকাবাকা লাইন দিয়ে যুক্ত থাকে— ঠিক চশমার মতো। হিন্দুধর্মে এই চিহ্নকে কৃষ্ণের পায়ের ছাপ বলে গণ্য করা হয়।

হিন্দুধর্মে কেউটের স্থান

কেউটে সাপকে সবথেকে শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করা হয়। শিবের গলায় কেউটে সাপ জড়িয়ে থাকে। বিষ্ণু যে সর্পদেবতার উপর বসেন সেটিতে কয়েকটি কেউটের মাথা আঁকা থাকে। নাগপঞ্চমীতে কেউটে সাপকেই পূজা করা হয়।

কোথায় থাকে?

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত জায়গাতেই এদের দেখা যায়। পাহাড়, ঘন জঙ্গল এবং সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গাতেও। স্থল এবং জল দুই জায়গাতেই, জঙ্গল কমে যাওয়ার জন্য এরা লোকবসতির কাছাকাছি চলে আসে।

ব্যবহার কেমন?

সাধারণত শান্ত প্রকৃতির। মানুষের থেকে দূরে থাকতে চায়, হয় লুকিয়ে থাকে অথবা চলে যায়। কিন্তু তাড়া করলে এরা যে বিশেষ কায়দায় ঘুরে দাঁড়ায় ভয় পাওয়ার জন্য সেটি যথেষ্ট— শরীরের প্রথম তৃতীয়াংশ মাটির উপর তুলে ফনা বিস্তার করে। এদের আপাতদৃষ্টিতে বেশ বিবেচক বলতে হবে— মানুষকে কামড়ানোর আগে অন্তত তিনবার বিভিন্নভাবে সাবধান করে। কেউটের কামড় সাধারণত খুব মারাত্মক হয় না। কারণ এই সাপ কামড়ানোর সময় খুব কম পরিমাণ বিষ নির্গত করে অথবা একদমই বিষ বের করে না (dry bite)। আত্মরক্ষার জন্য অথবা আক্রমণের সময় এরা প্রায় ৬-৭ ফুট দূর থেকে বিষ ছুড়তে পারে (spit) যা মানুষের চোখে বা শরীরের কাটা জায়গায় লেগে ভীষণ যন্ত্রণা দেয় এবং ক্ষত করে (Spitting Cobra)। বছরে প্রায় ছবার এরা চর্মত্যাগ (skin shedding) করে; যা এদের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং গতিসম্পন্ন করে।

যৌন প্রক্রিয়া এবং জনন

জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রক্রিয়া হয়। একটি স্ত্রী কেউটে ১২ থেকে ৩৬টি ডিম পাড়ে। ইঁদুরের গর্তে অথবা উঁইঢিবির মধ্যে স্ত্রী কেউটে ডিমগুলি আগলে রাখে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হতে প্রায় ৬০ দিন লাগে। মা কেউটে বাচ্চাগুলিকে আগলে রাখলেও খাবার খাওয়ায় না। বাচ্চাদের নিজেদের খাবার জোগাড় করার সামর্থ্য অর্জন করতে প্রায় দুসপ্তাহ লাগে; এই সময় এদের পাকস্থলিতে একটি থলি (yolk sac)থাকে যা প্রথম দুসপ্তাহ পুষ্টি যোগান দেয়। এই সময় থেকে এদের বিষথলিও কার্যকর হয়ে যায়।

খাদ্য

টিকটিকি, গিরগিটি, ব্যাঙ, পোকামাকড়, ছুঁচো, ইঁদুর, পাখি এদের খাদ্য। এরা নিজের বাচ্চাদেরও খায়। এরা শিকারকে গোটা গিলে খেতে পারে।

বিষ

এক ছোবলে কেউটে প্রায় ২০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ নির্গত করতে পারে। একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য ১৬ মিলিগ্রাম যথেষ্ট।

বিষক্রিয়া

এদের বিষ স্নায়ু অবশ করে (neurotoxin)। কামড়ের ১৫ মিনিট থেকে দুঘন্টার মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়। কেউটের বিষ দুই স্নায়ুর সংযোগস্থল (synapse)-একাজ করে। মাংসপেশি অবশ (paralysis) করে এবং আস্তে আস্তে শ্বাসপ্রক্রিয়ার মাংসপেশি অকেজো করে দেয়।

বিষক্রিয়ার উপসর্গ

- কামড়ের জায়গা ফুলে ওঠে ও ব্যথা হয়।
- কামড়ের জায়গায় ফোস্কা পড়ে।
- ঠোঁট এবং মুখের চারিদিকে অসাড় হয় (numbness)।
- স্নায়ু-অবশ শরীরের উপরাংশ থেকে নিচের দিকে নামে।
- চোখের পাতা পড়ে আসে (সেই জন্যে গ্রামবাংলায় ভুল করে বলা হয় কেউটের কামড়ের রোগীকে ঘুমোতে দিও না)। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। কারণ বিষ প্রতিষেধক দেওয়ার সময় পড়ে যাওয়া চোখের পাতা আস্তে আস্তে খোলে এবং সেই দেখে বোঝা যায় রোগীর উন্নতি হচ্ছে।
- চোখের স্বাভাবিক নড়াচড়া বন্ধ হয় (ophthalmoplegia)।
- মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে, ঢোঁক গেলার মাংসপেশি অবশ হয়।
- শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশি অবশ হয়ে শ্বাস প্রক্রিয়া বন্ধ হয় (respiratory paralysis)।

কামড়ানোর পর

১। রোগীকে বারে বারে ভরসা দিন। বোঝান যে বিষের প্রতিষেধক আছে এবং কেউটের কামড়ে অনেক কম বিষ ঢোকে।

২। কোনো শক্ত বাঁধন দেবেন না, কাটাছেঁড়া করবেন না।

৩। কামড়ের জায়গা হালকা করে বেঁধে (যাতে রক্ত চলাচল বন্ধ না হয়) নড়াচড়া বন্ধ করার চেষ্টা করুন।

৪। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালে চিকিৎসা

- টিটেনাস টক্সয়েড ইঞ্জেকসন।
- শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ আছে কিনা দেখা। সাপের কামড়ের দাগ দেখে কোন সাপের কামড়, বা বিষধর সাপ কিনা, এসব নির্ধারণ করা যায় না।
- ব্যথা হলে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিন; অ্যাসপিরিন ব্যবহার করা হয় না।
- কামড়ের জায়গার উপর শক্ত বাঁধন থাকলে আস্তে আস্তে বাঁধন খোলা হয়। শক্ত বাঁধনের জন্য ফুলে গেলে বাঁধন খোলার এক ঘন্টার মধ্যে সেই ফোলা কমে যায়।
- বিষক্রিয়ার উপসর্গ থাকলে বিষের প্রতিষেধক ইঞ্জেকসন (Anti Snake Venom) দেওয়া হয়।
- প্রতিষেধক ইঞ্জেকসন দেওয়ার আধঘন্টার মধ্যে রোগীর অবস্থার উন্নতি হয়, যদিও মনে রাখতে হবে উন্নতি হতে বেশ কয়েকঘন্টা লাগতে পারে।
- হাসপাতালে অন্তত ২৪ ঘন্টা রাখা হয়।

উপসংহার

কেউটের যে রূপ দেখে মানুষ ভয় পায়, ভয় দেখানোর জন্য কেউটে সেই রূপ ধারণ করে না। বিরক্ত না করে চলে যেতে দিলে কেউটে চলে যায় এবং সহজে কামড়ায় না। সাপকে ভালোবাসুন, সাপ থেকে দূরে থাকুন, সাপ মারবেন না।

লেখক পরিচিতি : ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার, এম বি বি এস, এম ডি, একটি সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

- স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ
- বাণিজ্যিক নয়— মানবিক

ভুল থেকে শেখা

যখন কোনো ভুলের ফলে কোনো রোগীর কোনো ক্ষতি হয় যা চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী উভয়েরই অনভিপ্রেত তখনই প্রশ্নটা উঠে আসে এটা কি এড়ানো যেত না? অনেক সময় এ প্রশ্নও উঠে আসে এটা কিভাবে সম্ভব হল? ভুলের দায় কোনো একজনের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়াটা সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে তা করাও হয়ে থাকে। কিন্তু এটা আসলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। মূল সমস্যা কিন্তু অনেক গভীরে। কোনো একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য কোনো স্বাস্থ্য দুর্ঘটনা ঘটেছে এমনটা না ভেবে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলির সার্বিক পর্যলোচনা করলে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা জনিত রোগীর ক্ষতির সম্ভাবনাও অনেক কমিয়ে ফেলা যায়— লিখছেন **ডা. অসীম চ্যাটার্জি**।

ভুল-র সমীক্ষায় জানা গেছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের ৫-২৫% ক্ষেত্রে কোনো না কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা জনিত ভুলের শিকার হতে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিষেবাজনিত স্বাস্থ্য দুর্ঘটনার হার কিভাবে কমানো যেতে পারে তা নিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে ও অনলাইনে একটি কোর্সও চালু করেছে। আমরা এর মূল বিষয়বস্তুগুলো আলোচনা করব যাতে লোকেদের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি কমে এবং এর ফলে যে অবাঞ্ছিত সমস্যার উদ্ভব হয় তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

মূল সমস্যা

ভুল হবার কারণগুলো কমাতে হলে পাঁচটি মূল সমস্যার দিকে নজর দেওয়া দরকার—

১. স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করা,

২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়ে পরিষেবা দেওয়ানো,

৩. পরিষেবা প্রদানকারী এবং পরিষেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন (যাতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে),

৪. ওষুধ জনিত ভুল সম্বন্ধে আগাম সতর্কতা গ্রহণ করা,

৫. রোগী এবং পরিবারের লোকেদের তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।

স্বীকৃত পদ্ধতি— প্রতিটি অপারেশনের জন্য একটি স্বীকৃত নিরাপদ পদ্ধতি রয়েছে যা ওই অপারেশনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। একে 'প্রটোকল' বলা হয়। অপারেশনের ঝুঁকি কমাতে এর বিকল্প নেই। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রটোকল ঠিকমত অনুসরণ করতে চান না। প্রটোকল না মানতে চাওয়ার কারণগুলো হল— তাঁরা মনে করেন এগুলি তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত দক্ষতা প্রকাশ পাবার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ। অথবা এতে তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যহত হবে। প্রটোকলের প্রশিক্ষণ না থাকার জন্যও অনেকে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন। সর্বোপরি নতুন কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করায় উদাসীন মনোভাব তাঁদের অজান্তেই ভুলের দিকে এগিয়ে দেয়। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণের বিপক্ষে অনেক সময় সওয়াল করা হয় যে এটি ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত নেবার পরিপন্থী। স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করার অর্থ কোনো মালের যোগান সুনিশ্চিত করা নয়। বরং এটি একটি পদ্ধতি যার সঠিক প্রয়োগের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ প্রক্রিয়ার (যেমন অপারেশনের ক্ষেত্রে) ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং ক্লিনিকাল সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা বাড়ায়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নিউজিল্যান্ডে সম্প্রতি অ্যানেস-থেটিস্টদের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালান হয় যেখানে ২০ জন অ্যানেসথেটিস্টকে এক অনুরূপ পরীক্ষা (simulation test) পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে যেখানে অপারেশন চলাকালীন অক্সিজেন সাপ্লাই ১৫ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। সব কজন অ্যানেসথেটিস্টই ওই সময়ে ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বিকল্প অক্সিজেন সিলিন্ডারটি লাগিয়ে ছিলেন কিন্তু শতকরা ৭০ জনই লক্ষ্য করেন নি যে বিকল্প অক্সিজেন সিলিন্ডারটি রাখা ছিল সেটি খালি (তাঁরা অপারেশন শুরু হবার আগে বিকল্প সিলিন্ডার ভর্তি আছে কিনা দেখে নেন নি)। এঁদের কেউই আবার যখন গ্যাস সাপ্লাই খুলে দেওয়া হল তখনও দেখে নিলেন না যে গ্যাস মিশ্রণ তাঁরা রোগীর ফুসফুসে প্রবাহিত করছেন তাতে গ্যাসের মাত্রাগুলি সঠিক রয়েছে কিনা। অথচ এই পরীক্ষাগুলি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অপারেশনের আগে আপাতকালীন ব্যবস্থা যাচাই করার প্রক্রিয়া যা অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও অনুসরণ করেন নি।

একই ভাবে শিশু বিভাগে 'রোগীর শ্বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে' অনুরূপ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলি খামতি ধরা

পড়ে— ১৭% ক্ষেত্রে সঠিক ডোজ নথিবদ্ধ করা হয় না, ৫৯% ক্ষেত্রে কিভাবে ওষুধ দেওয়া হয়েছে লেখা নেই, ১৬% ক্ষেত্রে সিরিঞ্জগুলিতে যা ওষুধ যাওয়ার কথা তার ২০% এরও বেশি বা কম মাত্রায় ওষুধ গেছে। এই উদাহরণগুলো স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা যায়। নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভুলের সম্ভাবনা কমে, রোগীরা জানতেও পারেন তাঁরা কী ধরনের চিকিৎসা পেতে চলেছেন এবং তাঁরাও অনেক সময় চিকিৎসার মান বাড়াতে সাহায্য করতে পারেন।

মানুষের ভুল হয়। ভুল ঘটে তার যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতির জন্য। পরিবেশ, বিশ্রাম না পাওয়া, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভুলের দিকে ঠেলে দেয়।

সঠিক এবং স্বীকৃত প্রশিক্ষণ— সাধারণত স্নাতকস্তরে চিকিৎসা পাঠক্রমে (যেমন এম বি বি এস কোর্সে) রোগীর নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটি পাঠক্রমের একটি দুর্বলতা এবং সঠিক পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গভীর ব্যর্থতা যার দরুন স্বাস্থ্য পরিষেবার নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। প্রধানত দুটি জায়গায় ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়, এক, রোগীর চিকিৎসার দরুন যে সমস্যা হতে পারে তার পূর্বানুমান ও ব্যবস্থা নেওয়া সম্পর্কে ঘাটতি। দুই, দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব যাঁরা আধুনিক ও নিরাপদ চিকিৎসা পদ্ধতিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এবং সময়ের সাথে সাথে এই ঘাটতি বাড়তে থাকে। (এটা বিশেষভাবে আমাদের রাজ্যে দেখা যায় যেখানে রোগীর নিরাপত্তাজনিত দক্ষ পরিষেবার অভাবে রোগীদের অন্য রাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতে হয়।) বিভিন্ন পেশায় বিশেষ করে বিমানযাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে পরিষেবা কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে যেখানে যাত্রী নিরাপত্তা বিষয়টিকে সর্বাধিকার দেওয়া হয়। এখানে কোনো আপোষ করা হয় না। রোগীর নিরাপত্তাকে যদি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় তাহলে একে ঘিরে এক প্রশিক্ষণ বলয় গড়ে উঠতে পারে যা এই পেশাকে একটি সদর্থক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে স্কটল্যান্ডের স্নাতকস্তরে চিকিৎসা শিক্ষণ পদ্ধতি, যেখানে রোগীর নিরাপত্তাজনিত শিক্ষণ বিষয়গুলি বিভিন্ন মডিউলের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেখানে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ছাত্রদের শেখনো হয় ভুল স্বীকার করার মানসিকতা। মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে এটা মেনে নিয়ে ভুল কোথায় হয়, ভুল কিভাবে এড়ানো যেতে পারে, চিকিৎসা নির্দেশগুলি পরিষ্কারভাবে নথিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা (নিজের ভুলও) এবং ভুল সংশোধনে অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি [যেমন যান পরিবহন সংস্থা, পানীয় জল পরিবহন সংস্থা, বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ এবং নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা (ডিসপোসাল) প্রভৃতি] কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা খতিয়ে দেখা এবং প্রয়োজনে সেগুলি গ্রহণ করা চিকিৎসা প্রশিক্ষণের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

মানুষের ভুল হয়। ভুল ঘটে তার যন্ত্র ব্যবহারে দক্ষতার ঘাটতির জন্য। পরিবেশ, বিশ্রাম না পাওয়া, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাস্থ্যকর্মীদের ভুলের দিকে ঠেলে দেয়। যে সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আলাদা করে দক্ষতা অর্জনের ট্রেনিং দরকার নেই সেইসব ক্ষেত্রেও ভুলের দরুন সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হয় যার ফলে রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনদের ভুগতে হয়। যদিও চিকিৎসা পরিষেবায় ব্যক্তি দক্ষতার মান ও উন্নতির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা চিকিৎসা পরিষেবার দিকনির্দেশিকার মধ্যেই রয়েছে, অনেকক্ষেত্রেই এটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না (বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে যেখানে সামাজিক বৈষম্য অবলুপ্তির হাতিয়ার হিসেবে লোকেদের এই পেশায় চাকরিতে নিয়োগপত্র দেওয়া হয় রোগীর নিরাপত্তার কথা না ভেবে)। একসঙ্গে কাজ করার মানসিকতা, কাজ করার প্রস্তুতি, সিদ্ধান্ত নেওয়া, ঝুঁকি নির্ধারণ করা এবং ফলাফল কি হতে পারে আন্দাজ করে সেই অনুযায়ী বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা, নিজের এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তির লিমিটেশন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা, এই সমস্ত কিছুই এক গভীর দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে এবং চিকিৎসা পরিষেবার মান বাড়াতে ও ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

অনুরূপ শিক্ষা (simulation) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের রোগী ও সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলার দক্ষতা অর্জনের জন্য (বিশেষ করে আপৎকালীন শুশ্রূষা) হাতে কলমে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন যতটা এই পেশায় এমনটা আর কোনো পেশায় নেই। কিন্তু এটা বাস্তব যে তার শিক্ষণ সময়ের মধ্যে সবকটি রোগী দেখার ও সমস্যা মোকাবিলা করার সুযোগ নাও হতে পারে। অনুরূপ শিক্ষণ পদ্ধতি এই ঘাটতি মেটাবার জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপায়। এখানে দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে একটি দল হিসেবে কাজ করার সুবিধা চিকিৎসার ফলাফলকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা জানার হাতে কলমে অভিজ্ঞতাও লাভ হয়।

চিকিৎসা বিদ্যাকে যুগ যুগ ধরে গুরুমুখী বিদ্যা হিসেবে দেখা হয়ে এসেছে। যেটি শিখেছো সেটিই অনুশীলন কর, সেটিই শেখাও— এমন ধারণা নতুনকে গ্রহণ করার পক্ষে এবং সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সঠিক প্রশিক্ষণের অভাব একজন স্বাস্থ্য কর্মীকে তাঁর নিজের দক্ষতার মূল্যায়নের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং অযথা ঝুঁকি নিতে উৎসাহিত করতে পারে। রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় স্তরে এজন্য চিকিৎসার উপযুক্ত মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিরাপদ ও ফলপ্রসূ হয়।

চিকিৎসা বিদ্যাকে যুগ যুগ ধরে গুরুমুখী বিদ্যা হিসেবে দেখা হয়ে এসেছে। যেটি শিখেছো সেটিই অনুশীলন কর, সেটিই শেখাও— এমন ধারণা নতুনকে গ্রহণ করার পক্ষে এবং সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

যোগাযোগ— তথ্যের সঠিক আদান-প্রদান সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম শর্ত। সমীক্ষায় জানা গেছে পরীক্ষায় ভুলের পিছনে ৬০ % ক্ষেত্রেই যোগাযোগের অভাব কাজ করেছে। সমন্বয়ের অভাব দু'ধরনের হতে পারে— স্বাস্থ্যকর্মীদের নিজেদের মধ্যে বা স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীর মধ্যে। রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ একটি জটিল বিষয় এবং খুব হালে এ বিষয়টিতে

আলোকপাত করা হচ্ছে ও বিষয়টি বোঝার চেষ্টা চলছে। পঞ্চাশ বছর আগে রোগীরা চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় ক্ষমতার ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল ছিলেন এবং এবিষয়ে চিকিৎসকের মতামতই চূড়ান্ত ধরা হত। এখন রোগীরা চিকিৎসককে তাঁদের একটি জটিল সমস্যার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখতে চান এবং এই প্রক্রিয়া চলাকালীন তাঁদের (অর্থাৎ রোগীদের) ঘিরে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে তাতে নিজেদের মতামত ও ভূমিকা গ্রাহ্য হবে এমনটাই আশা করে। এই দুই বিপরীত মেরুর আচরণের কোনো একটি সবক্ষেত্রে আদর্শ যোগাযোগ রক্ষা করবে ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করবে এমনটা মনে করা ঠিক নয়, বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তের রকমফের করাটাই উচিত কাজ হবে। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে বিভিন্ন মাধ্যমে বার্তা বিনিময় হয় যেমন কথা, লেখা প্রভৃতি। এরমধ্যে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে শরীরী বার্তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে সামান্যই কাজ হয়েছে। চিকিৎসকের হাবভাবে চিকিৎসক কী বললেন রোগী বা বাড়ির লোক অনেক সময় ভেবে নেন। এবং সেই ভাবা তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যদি রোগী (এবং বাড়ির লোকেরা) ও স্বাস্থ্যকর্মীর মধ্যে সরাসরি এমন ভাষায় কথা হয় যা তাঁরা উভয়েই বুঝতে পারেন তাহলে শুধু ভুল বোঝাবুঝিই কমে না, চিকিৎসার খরচেরও সুরাহা হয়। যেটা এখনও পরিষ্কার নয় কীভাবে সেটা সম্ভব করা যায়। পেশাদার দোভাষীর সাহায্য নেওয়া অবশ্যই একটি উপায়, কিন্তু তাঁদের সহজে পাওয়া যায় না উপরন্তু খরচের একটা ব্যাপার থাকে। সরাসরি কথা বলার মধ্যেও দেখা গেছে আলোচনায় স্বাস্থ্যকর্মী এমন সব ডাক্তারি শব্দ ব্যবহার করছেন যার অর্থ রোগীর বোধগম্য হচ্ছে না। অনেক সময় তাঁরা এমন সব প্রশ্নের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন যার উত্তর হয় হ্যাঁ অথবা না। এর ফলে রোগীর বাড়ির লোকেদের আলোচনায় অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর একটি সমস্যাও রয়েছে কিভাবে অপারেশনের বা অন্য কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির ঝুঁকি রোগীকে অযথা আতঙ্কিত না করে বোঝানো যায় তার পদ্ধতি। স্বাস্থ্যকর্মীদের এজন্য প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার কিন্তু সুযোগ সীমিত। স্বাস্থ্য কর্মী ও রোগীর যোগাযোগের আর একটি উপায় লিখিত তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতা এর এক বড় অন্তরায়। তাছাড়া বহু লোক লিখিত তথ্য ঠিকমত বুঝতে পারেন না। অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিও দুর্লভ।

স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব রোগীর নিরাপত্তা ব্যাহত হবার পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ডিউটি পরিবর্তনের সময় অসম্পূর্ণ 'হ্যান্ড ওভার', অপরিষ্কার লেখা ঠিকমত পড়তে না পারা এবং পরিষ্কার নির্দেশ না

লেখা এর কয়েকটি উদাহরণ। এছাড়া জুনিয়র ডাক্তারের সিনিয়র ডাক্তারের ভুলকে দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করতে না পারার মানসিকতাও চিকিৎসাজনিত ভুলকে বাড়াতে সাহায্য করে (এর জ্বলন্ত প্রমাণ এ রাজ্যে সাম্প্রতিককালের একটি মামলা যেখানে একজন প্রবীণ চিকিৎসকের ভুল আদালতে প্রমাণিত হয়েছে)। বিশেষ করে হাসপাতালে এটা প্রমাণিত স্বাস্থ্য পরিষেবা একজনের উপর না ছেড়ে দিয়ে একটি গোটা দলের সবাই এর সঙ্গে জড়িত থাকলে ভুলের সংখ্যা কমে এবং ভুলের দায়িত্ব স্বীকার করার মানসিকতা অনুশীলন করলে ক্ষতিপূরণের মামলার সংখ্যাও কমে। ভুল করার পর সেই ভুলের দায় এড়ানোর চেষ্টার চেয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে সঠিক তথ্য জানানো অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার থেকে রেহাই দেয়।

ওষুধ সম্পর্কীয় নিরাপত্তা— অতীতে ওষুধ সম্পর্কীয় নিরাপত্তার ধারণা ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াকে ঘিরেই তৈরি হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও ভুল ওষুধ ব্যবহার, ভুল মাত্রায় প্রয়োগ, ভুল পথে (যেমন পেশিতে না দিয়ে শিরায় দেওয়া, সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের মধ্যে দেওয়া প্রভৃতি) প্রয়োগ তালিকাটি দীর্ঘ করেছে। সমীক্ষায় প্রকাশ হাসপাতালে ভর্তি ৫-১০% রোগীর মৃত্যুর কারণ ওষুধের প্রতিক্রিয়ার ফলে যা ৭৫% ক্ষেত্রে এড়ানো সম্ভব। এছাড়া প্রতি তিনজন রোগী ভর্তির মধ্যে একজন কোনো না কোনো ভুল ওষুধ প্রয়োগের (অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সহ) শিকার হন। ডাক্তারের খারাপ হাতের লেখা নিয়ে রসিকতা চালু রয়েছে যে তাঁদের লেখা প্রেসক্রিপশনে ওষুধের নাম পাঠোদ্ধার করা যায় না। এটা কিছুটা সত্যি হলেও প্রেসক্রিপশনে আরও কিছু রয়েছে যা সমান গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ওষুধের মাত্রা, সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্ত ওষুধের প্রয়োগবিধি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রেসক্রিপশনের বাইরে ওষুধ যেমন ওষুধের দোকানির কথায় ওষুধ কেনা ও খাওয়া— এটি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। ওষুধ নিয়ে অসুস্থ বোধ করলে তা স্বাস্থ্যকর্মীকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে রোগী ও বাড়ির লোকেদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর পারস্পরিক সুষ্ঠু বোঝাপড়া থাকলে এ ধরনের দুর্ঘটনার হার কমে। ওষুধের প্রয়োগবিধির লেবেল সেটে, হাতে লিখে দেবার চল বহু জায়গাতেই রয়েছে। প্রয়োজন নজরদারির, যাতে একজনের ভুল সহজেই অন্যজনের নজরে পড়ে। যে সব ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মারাত্মক সেই সব ওষুধের প্রয়োগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের দিয়েই একমাত্র করানো উচিত। কাছাকাছি নামের ভিন্ন ওষুধ ভুলের সুযোগ বাড়ায়। এছাড়াও দরকার রোগী ট্রান্সফার বা ছুটির সময় পরিষ্কার ভাবে রোগী কি কি ওষুধ কখন কিভাবে নিচ্ছেন তা লিখে দেওয়া। অনেক ওষুধই নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত, তা না হলে তার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে অথবা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোনো ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সন্দেহ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে জানিয়ে সতর্ক করার ব্যবস্থা ভবিষ্যতের বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে।

রোগী ও বাড়ির লোকেদের চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত করা— অনেক রোগীর চিন্তাতেই থাকে না যে চিকিৎসা গ্রহণ করার মধ্যে কোনো ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকতে পারে। চিকিৎসা দেওয়া এবং নেওয়া পরিষেবা একটি পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে। রোগীদের সেই পরিষেবার মধ্যে আরও বেশি করে যুক্ত করা

সেই বিশ্বাসের অবস্থানকে দৃঢ় করে ও রোগী নিরাপত্তা বিষয়টিকে মজবুত করে। বিভিন্ন ভাবে এটা করা যেতে পারে— যেমন রোগ ও সম্ভাব্য চিকিৎসা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ছবি রোগীদের সামনে রাখা (অবশ্যই প্রাপ্ত তথ্যের ও অনুমানের ভিত্তিতে) যাতে তাঁরা চিকিৎসা গ্রহণ করা বা না করা সম্বন্ধে মতামত দিতে পারেন। রোগী ও তাঁর পরিবারের লোকেদের তাঁদের আশঙ্কার কথা (চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত) স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করার জন্য উৎসাহিত করা একটি সদর্থক পদক্ষেপ এবং পরিবারের কেউ যদি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকেন তাহলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। রোগী-সহায়তা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত সংস্থাগুলি চিকিৎসা-নিরাপত্তার বিষয়গুলি তাদের কাজের পরিধির মধ্যে রেখেছে এবং তাদেরও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করা দরকার। এখানে রোগীদের নিজেদের অভিজ্ঞতার বিনিময়ও একটি সুস্থ ও নিরাপদ চিকিৎসা পরিষেবার পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে।

রোগীরা অনেক সময় তাঁদের চিকিৎসার ব্যাপারে মতামত দিতে ইচ্ছুক হন না কারণ এটা তাঁরা তাঁদের অধিকারের পরিসীমার বাইরে বলে মনে করেন। তাঁরা অনেক সময় চিকিৎসা পরিষেবার ঝুঁকির কথা জানেন না এবং এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে। চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে রোগীর লিখিত ও মৌখিক সম্মতি অনেক অবাঞ্ছিত জটিলতা থেকে রক্ষা করে। স্বাস্থ্যকর্মীরা অনেকক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাঁদের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারকে সহজ ভাবে নিতে পারেন না, বিশেষ করে যখন রোগী নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসেন। ধরেই নেওয়া হয় তাঁরা নিজেদের চিকিৎসা ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নন। অনেকে এটাও ভাবেন রোগীদের চিকিৎসাজনিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত করলে অযথা সময় ব্যয় হয়, যদিও এ ধারণা সঠিক নয়।

রোগী এবং তাঁর পরিবারের লোকজন তখনই অভিযোগ করেন যখন চিকিৎসায় অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা একটা নিশ্চুপ, নিরুত্তর দেওয়ালের মুখোমুখি নিজেদেরকে আবিষ্কার করেন যা তাঁদের অধিকারকে অস্বীকার করেছে এমনকি তাঁদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণও করেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগী-চিকিৎসকের পারস্পরিক বিশ্বাসে সহজেই ভাঙন ধরে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সঙ্গে রোগী মানসিক-ভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে স্বাস্থ্যকর্মীর অসাবধানতায় তাঁর ক্ষতি (করা) হয়েছে। আমাদের দেশের বহু জায়গায় রোগীরা কোনোরূপ স্বাস্থ্য পরিষেবা পেলেই নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করেন তাই তাঁরা চিকিৎসার গাফিলতির দরুন ক্ষতির কারণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চান না। তাঁরা মনে করেন এতে তাঁদের চিকিৎসকের প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ করা হবে। অথবা যেটুকু পরিষেবা পাচ্ছিলেন সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হবেন। রোগীরা অনেক সময় চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করেন যে কারণ জানতে চাইলে তাঁদের চিকিৎসা-জনিত ভুলের তথ্য প্রকাশ করা হয় না। এর পরিণামে মামলা-মোকদ্দমা আইনি-ব্যবস্থা এমনকি হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটে যায়।

সাম্প্রতিককালে রোগীরা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যাঁরা তাঁদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে ইচ্ছুক। পারস্পরিক স্বচ্ছ এবং অকপট সম্পর্ক স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যতম শর্ত। রোগীদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার দেওয়াটা স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিষেবার মধ্যেই পড়ে। রোগী-চিকিৎসক সম্পর্কে যাতে বিশ্বাসের জায়গাটা অটুট ও মর্যাদাপূর্ণ থাকে তার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে যেতে হবে।

তথ্যসূত্র: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

(এই লেখাটির একটি সংস্করণ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার জানুয়ারি ২০১১-ডিসেম্বর ২০১১ সংখ্যায় 'রুগীর নিরাপত্তা : ভুল থেকে শেখা' শিরোনামে মুদ্রিত হয়েছিল। লেখকের অনুমতিক্রমে এই পত্রিকায় তার অংশবিশেষ মুদ্রিত হল।)

লেখক পরিচিতি: ডা. অসীম চ্যাটার্জী এম বি বি এস, এম ডি, জেনারেল মেডিসিনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। লেখক ও প্রাবন্ধিক, চিকিৎসাসংক্রান্ত বিষয়ে এবং মানবিক সমস্যা ও মূল্যবোধ নিয়ে তাঁর লেখা বহু প্রবন্ধ ও কিছু বই রয়েছে।

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিনতলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেসন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপণ- এর উল্টোদিকে)। অম্লান দত্ত বুকস্টোর, বিধাননগর পৌরসভা— এফ ডি ৪১৫/এ। দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

হাসপাতাল-লব্ধ সংক্রমণ

এক নিবারণযোগ্য মৃত্যুর কাহিনী

ছোট্ট এক সার্জিক্যাল পদ্ধতি, তাতে প্রিয়জন মারা গেলে ব্যথিত বিস্ময়ে ভাবতে বসতে হয়— এইসব চেয়েছিলাম বুঝি? এই আই সি সি ইউ, এই বোধহীন দেহ নাড়াঘাঁটা, এইসব নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন যন্ত্র আর যন্ত্রমানব? চোখ যায় আয়নায়, নিজের প্রতিকৃতি উল্টে আঙুল তুলে বলে— তুমি, দোষী কি নও তুমিও! হাসপাতাল-লব্ধ সংক্রমণে মায়ের মৃত্যুর পর তার মানবিক আর প্রযুক্তিগত দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখছেন কন্যা **ইন্দ্রানী দত্ত**।

আর্থোস্কোপি পরবর্তী ভয়াবহ সংক্রমণে সেপটিক শকে আক্রান্ত হয়ে গত জুন মাসে মা চলে গেল— আজ চারমাস হল। এই লেখায় ব্যক্তিগত শোক জনসমক্ষে আনার উদ্দেশ্য 'হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশন' বা হাসপাতাল-লব্ধ সংক্রমণ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে সহায়ক হবে— এই ভাবনা সঞ্জাতই আমার লেখাটি। অভিজ্ঞতার পাশাপাশি রইল কিছু প্রশ্ন আর তার উত্তর খোঁজা— আমার মতো করে।

আশৈশব মার থেকেই জেনেছি কোনো কথা বলার আগে ভাবতে; কাউকে দোষারোপ করার আগে সে ঘটনায় নিজের দোষের ভাগ নিরূপণ করতে। এ লেখায় ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানকে দোষারোপ নয়; আঙুল যদি ওঠেও, তা আমাদেরই ত্রুটি, আমাদেরই খামতিগুলির দিকে।

মার অপ্রত্যাশিত চলে যাওয়ার মূলে সেপ্টিসেমিয়া; আর্থোস্কোপির পরে বাড়ি ফিরে আসার একদিনের মধ্যে সেপটিক শকে (হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্ট ৩০,০০০, পালস ৪০ মিনিট, ব্লাড প্রেশার ভয়াবহ রকম কম) আক্রান্ত হল মা। সংক্রমণ হাসপাতাল থেকেই এসেছে, নয়তো হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার একদিনের মধ্যে সেপটিক শকের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর নয় বলেই মনে করি। প্রশ্ন ওঠে— সংক্রমণ কিভাবে এবং কেন হল? বইপত্র, জার্নাল, ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য বলে ঃ অপারেশন থিয়েটার বা সার্জারিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা ক্যাথেটার সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না হলে এই সংক্রমণ রক্তে মিশে যাওয়া সম্ভব। এই অনভিপ্রেত ঘটনা হাসপাতালের পরিচালনার ত্রুটিকেই চিহ্নিত করে। যে সকল কর্মীর দায়িত্ব হাসপাতাল/সার্জারিতে বা রোগীর ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত রাখা তাঁরা সে কাজ সঠিক ভাবে না করলে এ ঘটনা ঘটতেই থাকবে। যে যন্ত্রে সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট জীবাণুমুক্ত করা হবে, সেটি কাজ করছে কিনা, সর্বোপরি জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়ার নিয়ম-কানুনগুলি সঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে কড়া নজরদারি আবশ্যক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে নিয়ম করে অপারেশন থিয়েটার, অপারেশনে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, ক্যাথেটার ইত্যাদি পরীক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। চিকিৎসক, অচিকিৎসক নির্বিশেষে সমস্ত কর্মীর এবং আত্মীয়স্বজনের পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলা প্রয়োজন। এক কথায় দায়িত্ব হাসপাতালের প্রতিটি স্তরের এবং আমাদেরও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন— সর্বাধুনিক ওষুধেও কাজ হল না কেন? বার্ধক্যজনিত কারণে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া ছাড়াও মা-র এই সংক্রমণ নসোকোমিয়াল স্ট্রেন-জনিত (অর্থাৎ হাসপাতাল থেকে আগত রোগ-জীবাণু) অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট ব্যাক্টেরিয়া। অ্যান্টিবায়োটিক প্রটোকল না মানার কথা উঠে আসবেই। কিন্তু এ অপরাধে চিকিৎসককে দোষী করার পাশাপাশি নিজেদেরও দোষী করতে হয়। মুড়ি-মুড়কির মতো অ্যান্টিবায়োটিক খাই আমরা, সামান্য সর্দি-জ্বরেই ওষুধের দোকানে গিয়ে নিজেরাই কিনে আনি অ্যান্টিবায়োটিক, ডোজ ঠিক করি নিজেরাই, চিকিৎসককে বহু সময় বাধ্য করি অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতে। আমাদের নিজেদের কোনো সচেতনতাই নেই এ ব্যাপারে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যদি মিডিয়াকে সঠিক ব্যবহার করতে পারে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে তবে তা কার্যকরী হবে বলে আমার ধারণা। এছাড়া, খেয়াল রাখতে হবে হাসপাতালের বর্জ্য জল যেন সাধারণ বর্জ্য জলে না মেশে, হাসপাতালের বর্জ্য জলে যে অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকে তা সাধারণ বর্জ্য জলে উপস্থিত জীবাণুকে ক্রমশ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট করে তুলবে। সরকারি তরফে কোনো নীতি আছে কি?

থাকলেও তার প্রয়োগ? প্রেসক্রিপশন অডিটের কথা উঠবেই। প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। শুধু মানব চিকিৎসায় নয়, কৃষি ও খামারে পশুপালনের ক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে নজরদারি আবশ্যক।

২০০২ সালে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ ইন্টেনসিভ কেয়ার মেডিসিনের সেপসিস সারভাইভিং ক্যাম্পেইনে বার্সেলোনা প্রটোকল ছ-দফা অ্যাকশান প্ল্যান প্রকাশ করে, এই পরিকল্পনায় ডায়গনসিস এবং ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি রাখা হয়েছে অ্যাওয়ারনেস, এডুকেশন, কাউন্সেলিং আর রেফারেলকে। সচেতনতা আর সঠিক শিক্ষার কথা ঘুরে ফিরে আসেই।

প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আমার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা বলি। মাকে ভিজিটিং আওয়ারে দেখতে গিয়ে একদিন দেখি অক্সিজেন মাস্ক লাগানো থাকা সত্ত্বেও মা অসম্ভব কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে; মনিটরে দেখলাম অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৮২ %, রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার আপন মনে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি বাইপ্যাপ দেওয়া দরকার কিনা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে ফোন করে জেনে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে। তিনি তখন ধীরেসুস্থে ফাইল উল্টে জানলেন ও জানালেন, স্যাচুরেশন এতটা কম হলে সেরকম নির্দেশই আছে বটে। তারপর নীল জামা পরা এক সেবিকাকে হুকুম করলেন বাইপ্যাপ লাগাতে। সেবিকা অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিয়ে বাইপ্যাপ লাগাতে শুরু করলেন বাইপ্যাপ মেশিন চালু না করেই। স্যাচুরেশন দ্রুত নিচে নামতে লাগল— আমি চিৎকার করে উঠতে আর এম ও এসে সেবিকাকে বকাবকি শুরু করলেন। এবারে অন্য আর একজন এগিয়ে এসে অক্সিজেন মাস্কটি আবার পরিয়ে, মেশিন চালু করে বাইপ্যাপ দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করলেন। আমরা কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু ওই সেবিকার যেন চাকরি না যায় সেই অনুরোধও করেছি সঙ্গে সঙ্গে। সংশ্লিষ্ট আর এম ও ধমক খেয়েছেন হয়তো। আমাদের মৌখিক আশ্বাস দেওয়া হল— এরকম আর হবে না। কিন্তু সমস্যা তো অন্য জায়গায়— উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া সেবিকারা ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে কাজ করছেন— এর দায় কে নেবে?

বার্সেলোনা প্রটোকলে কাউন্সেলিং-এর কথা বলা আছে। এ প্রসঙ্গে শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক শুশ্রূষার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করি।

মা সেপটিক শক নিয়ে ভর্তি হওয়ার পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালের আই সি সি ইউ-তে ছিল ৭ দিন, হাই-ডিপেন্ডেসি ইউনিটে ১৩ দিন, আর শেষ দিনটি আই সি সি ইউ-র ভেন্টিলেটরে। প্রথম পনের-ষোলো দিন মা-র জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় ছিল— হাই-ডিপেন্ডসি ইউনিটের অন্যান্য রোগীদের যন্ত্রণা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছিল মা, নানাবিধ জৈবিক শব্দ কানে আসছিল। শরীরের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসা, ক্রিটিকাল কেয়ারে থাকা, কিন্তু তার সঙ্গে কি মানসিক শুশ্রূষার কথাও ভাবা উচিত নয়? সমস্ত দিন ওই পরিবেশে— আত্মীয়স্বজনবিহীন। এই পরিবেশ কি বেঁচে থাকার ইচ্ছেকে বাড়িয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারে? একথা কেউ আদৌ ভাবছেন?

যে কথা বারেবারে মনে হয়েছে— আমরা যেখানেই কাজ করি না কেন— সরকারি বেসরকারি যে প্রতিষ্ঠানেই হোক— যে পেশাতেই থাকি না কেন— চিকিৎসক, অচিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাইকর্মী, ম্যানেজার কি আত্মীয়স্বজন— আমরা যেন নিজের কাজটি ঠিকমত করি, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকি এবং অন্যকে সচেতন করি।

চরম অবিশ্বাসী হয়েও এই মুহূর্তে ভাবতে ভালো লাগে, মা-র এখন আর কোনো কষ্ট নেই, মা খুব সুন্দর একটা জায়গায় আছে, যেখানে নদী, পাহাড় আর পাখি; মা সুবিনয় রায় শুনছে, বই পড়ছে, মা ভালো আছে খুব। আমরা নিজেরা নিজের কাজ ঠিকমত করলেই এই সুন্দর জায়গাটির অবস্থান অবিশ্বাসীর কল্পনায় কিম্বা বিশ্বাসীর স্বর্গে হতে হয় না।

লেখক পরিচিতি: ইন্দ্রানী দত্তের মা থাকতেন কলকাতাতে, সম্প্রতি কলকাতাতেই মারা গেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর ইন্দ্রানী সে ঘটনাটির কথা একটু অন্য ভাষায় 'ফেসবুক'-এ ও 'গুরুচন্ডালী' বলে একটি ওয়েব-ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন। বর্তমান লেখাটিতে সেই কথাগুলিই একটু অন্যভাবে এসেছে— মহালয়ার দিন এই লেখাটি তাঁর মাতৃ-তর্পণ।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৪৮ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

হাসপাতালের অসুখ

হাসপাতালে মানুষ যায় রোগ সারাতে। অথচ হাসপাতাল থেকে আক্রান্ত হয় নতুন অসুখে, অনেক সময় মৃত্যুও ঘটে। কেন? — তা নিয়ে বলছেন ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত।

নবতিপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আরোগ্যের আশায় ভর্তি হলেন লবণ হ্রদ অঞ্চলের পাঁচতারা হাসপাতালে। বার্ধক্যজনিত কিছু রোগ ও শ্বাসকষ্ট। ভর্তির সময় কিন্তু মরণাপন্ন ছিলেন না। হাসপাতাল থেকেই সংগ্রহ করলেন জীবাণুর সংক্রমণ। শ্বাসপ্রশ্বাস কৃত্রিমভাবে চালু রাখার জন্য যে শ্বাসনল প্রবেশ করানো হয়েছিল, সেই পথেই সম্ভবত সুযোগসন্ধানী জীবাণুদের অনুপ্রবেশ। একটি নয়। দুটি নয়— একেবারে তিন তিনটি। বিচিত্র সব নাম--- ক্লেবসিয়েলা, সিউডোমোনাস, অ্যাসিনেটোব্যাক্টর। এদের বসবাস হাসপাতালের যন্ত্রপাতি, কাপড়চোপড়, ধুলোময়লার মধ্যে। সুস্থসবল মানুষকে সবসময় ঘায়েল করতে না পারলেও রোগে দুর্বল মানুষ— মূলত শিশু ও বৃদ্ধরা এদের প্রধান শিকার। বৃদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দুইটি ফুসফুসে ছড়িয়ে গেল মৃত্যুদূতেরা। সে যাত্রায় বাড়িতে গেলেও, অব্যবহিত পরেই দারুণ অসুস্থতা, আবার হাসপাতালে ভর্তি এবং সংক্রমণ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার কারণে (Septicemia) মৃত্যু। অকালে তিরোধান বলা যাবে না, তবে মানুষটি আরো কিছুদিন হয়তো বাঁচতেন। হতে দিল না পাঁচতারা হাসপাতালের দূষিত পরিবেশ। প্রমাণ? মুখ্যমন্ত্রীর কফ ও শ্বাসনালী ধোয়া তরল (broncho-alveolar lavage) থেকে এই তিনটি জীবাণু উদ্ধার হয়। কিন্তু প্রথমবার যখন ভর্তি হয়েছিলেন তখন কোনোটিই ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারবর্গ বা পার্টি চিকিৎসায় অবহেলার মামলা করতে পারতেন। মামলা দূরস্থান, বিষয়টি পার্টির নেতৃবৃন্দ চেপেই যান। কারণটি অতি পরিষ্কার। ঐ হাসপাতাল পার্টিরই এক সদস্য, কারবারি কমরেড-এর। এবং তিনি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দারুণভাবে আশীর্বাদ-ধন্য। নব্বইয়ের দশকে প্রয়াত নেতাই ঐ স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীকে প্রায় বিনামূল্যে দান করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, যৌথ উদ্যোগের নামে। তার থেকেই ঐ ব্যবসায়ী কমরেডের প্রবল উত্থান ও কলকাতার তিনটি মেগা হাসপাতালের মালিকানা। গত ডিসেম্বর মাসে প্রধান হাসপাতালটি ৯২ জন রোগী সহ ভস্মীভূত হয়েছে। সে বৃত্তান্ত সবাই জানেন। কিন্তু অনেকেই বোধহয় জানতেন না 'অদৃষ্ট'-এর এই নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা। বিশেষ অনুগৃহীতের হাসপাতালে চিকিৎসা বিভ্রাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুর কাহিনী।

হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে গেলেন এক রোগ সারাতে বা কোনো জরুরি অস্ত্রোপচারের জন্য। আর শরীরে ঢুকল আর এক সংক্রামক (infectious) রোগ। তাতে অসুস্থতা বাড়ল, হাসপাতালে ভর্তি থাকা দীর্ঘায়িত হল। অথবা আপাতভাবে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার দিন কয়েক পরে নতুন করে রোগ ধরা পড়ল যা আগে ছিল না। এমনকি এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। একে ইংরেজিতে বলে nosocomial infection। সঠিক পরিভাষার অভাবে আমরা এর নাম দিচ্ছি 'হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ।' এর সংখ্যাটা কিন্তু কম নয়। সারা পৃথিবীতে এই ধরনের সংক্রমণে অসুস্থতা বা মৃত্যুও অনেক। এসব নিয়েই এবারের আলোচনা।

কাকে 'হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ' বলব? ইতিহাসের পাতা থেকে—

১৮০১ সালেই প্রখ্যাত চিকিৎসক জন বেল এই ধরনের সংক্রমণের এক সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে—

হাসপাতাল সূত্রে সংক্রমণ এমন এক ধরনের সংক্রামক রোগ যা হাসপাতালে যাবার সময় রোগীর দেহে ছিল না। এমনকি তা 'ইনকিউবেশন পিরিয়ড'-এর মধ্যেও ছিল না। রোগী হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন অথবা হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার পরেও এই সংক্রমণ দেখা যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, ইনকিউবেশন পিরিয়ড (incubation period) শব্দবন্ধটির অর্থ হল রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পর থেকে রোগের লক্ষণ দেখা দিতে যে সময় লাগে, সেই সময়।

হাসপাতাল বা চিকিৎসালয়ে ভর্তি থাকাকালীন যে অন্য রোগে রোগী আক্রান্ত হতে পারেন তার উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছরের এক মিশরীয় প্যাপিরাসের লেখায় পাওয়া গেছে। খৃষ্টপূর্ব ৬০০ বছরে প্রখ্যাত ভিষগ চরক ও খৃষ্টপূর্ব ৪০০ বছরে শল্যবিদ সুশ্রুত তাঁদের সংহিতায় এই ধরনের অসুখের উল্লেখ করেছেন। লুই পাস্তুর ১৮৫৬ সালে নির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করেন যে জীবাণুই মদ গেঁজে যাওয়ার কারণ। তিনি রসায়নবিদ হয়েও জীবাণুতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। এর আগে ধারণা ছিল জল থেকে, দূষিত বাতাস থেকে স্বয়ম্ভু হিসাবে এইসব জীবাণুর বা সংক্রামক রোগের উদ্ভব। পাস্তুরই প্রথম দেখালেন যে জীবাণুর সৃষ্টি হয় জীবাণু থেকেই। ১৮৭৩ সালে 'অ্যাকাডিমিয়া ডি মেডিসিন' (Acadimie de Medicine) এর সভায় তাঁর প্রখ্যাত বক্তৃতায় পাস্তুর বলেন—

''আমার যদি শল্যবিদ হবার সৌভাগ্য হত, তাহলে অস্ত্রোপচার করার সময় আমি কেবল সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করতাম না, বা নিজের হাতই পরিষ্কার করতাম না— আমি ১৩০০-১৫০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে উত্তপ্ত স্পঞ্জও ব্যবহার করতাম সবকিছু পরিষ্কার করার জন্য। তা সত্ত্বেও রোগীর শয্যার চারপাশের বাতাসে যে সব জীবাণু আছে, তার থেকে সংক্রমণের বিপদ মাথায় রাখতে হত।''

স্বাভাবিকভাবেই, পাস্তুর হাসপাতাল বা আরোগ্যকেন্দ্রের থেকে সংক্রমণ সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৮৬১ সালে সেমেলউইস (Semmelweiss) পর্যবেক্ষণ করেন যে প্রসূতি মায়েদের সন্তান জন্মের পরে যে সংক্রমণ হয়, তা অনেকক্ষেত্রেই চিকিৎসাকর্মী বা ছাত্রদের শরীর থেকে আসে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলও সেবিকাদের কাজের নীতি ও পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে হাসপাতালের জিনিষপত্র বা অন্য রোগীদের থেকে আসা ছোঁয়াচে অসুখ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছিলেন।

লিস্টার হলেন জীবাণু প্রতিরোধী বা Antiseptic তত্ত্বের জনক। ১৮৮৩ সালে গুস্তাভ নিউবার শল্যক্রিয়ার সময় মুখোশ, গাউন এবং দস্তানার ব্যবহার চালু করেন। ১৮৯৬ সালে বার্গম্যান আরম্ভ করেন অস্ত্রোপচারে লাগে এমন সমস্ত জিনিষের বাষ্পের দ্বারা নির্বীজকরণ (steam sterilisation)। উল্লেখ্য যে এই সময়ের মধ্যে (১৮৮৮-১৯০৪) প্লেগ, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড, গনোরিয়া, নিউমোনিয়া, টিটেনাস, সিফিলিস প্রভৃতি রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হয়। হাসপাতালে ছড়ানো সংক্রমণ সম্পর্কেও জানা যায় বহু নতুন তথ্য। যদিও জীবাণুনাশক ব্যবহার করা এবং নির্বীজকরণ ছাড়া এইসব সংক্রমণের সঙ্গে লড়াই করার কোনো অস্ত্র চিকিৎসকদের কাছে ছিল না। কেননা প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হতে তখনো চার দশক বাকি।

হাসপাতালে ছড়ানো সংক্রমণের কারণ

সাধারণত অসুখের ফলে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া মানুষেরা, শিশু ও বৃদ্ধেরা, যাঁরা দীর্ঘকালীন

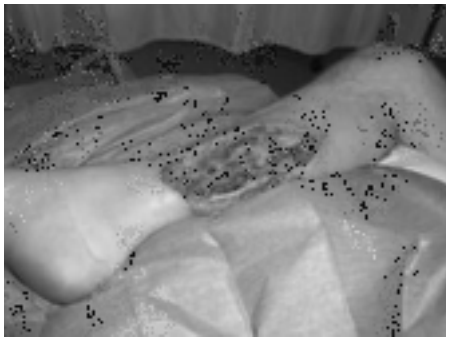

অসুখে ভুগছেন (যেমন মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপ, যক্ষ্মা, ক্যানসার বা এইড্‌স)— এইসব রোগীরা এই ধরনের সংক্রমণের প্রধান শিকার। এই ধরনের রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হয়। তাছাড়া হাসপাতালের ধুলো, হাওয়া, জল, বিছানার চাদর, যন্ত্রপাতি, মেঝে বা বাসনপত্রের মধ্যেও রোগীর দেহ থেকে আসা নানা ধরনের জীবাণু থাকে। রোগীদের হাঁচি-কাশি, মল-মূত্র, ক্ষত থেকে বের হওয়া পূঁজ, দেহরস প্রভৃতি থেকে বের হওয়া অসংখ্য ধরনের জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী বা অণুবীক্ষণিক ছত্রাক) হাসপাতালের পরিবেশের মধ্যে মিশে থাকে এবং অন্য রোগীদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব জীবাণুদের অধিকাংশই আবার বহুধরনের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী (Multi-Drug Resistant)। অর্থাৎ বেশিরভাগ সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক এদের বিরুদ্ধে কাজ করে না। নানা ধরনের বংশাণু পরিবর্তন বা mutation-এর ফলে হাসপাতালের পরিবেশে বৃদ্ধি পাওয়া অনেক জীবাণুই বহু প্রতিরোধী হয়ে গেছে।

সংক্রমণের উৎস

১। দূষিত জল, বাতাস, খাদ্য বা চিকিৎসায় ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

২। ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিক ভাবে জীবাণুমুক্ত না করা।

৩। কাপড়চোপড়, পোশাক, বিছানার চাদর, পর্দা প্রভৃতি।

৪। হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ (Biomedical waste)।

৫। হাসপাতালের কর্মী, অন্য রোগী বা রোগীর আত্মীয়স্বজনদের শরীর থেকে আসা জীবাণু।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আই সি সি ইউ (ICCU) তে ভর্তি হওয়া রোগী, প্রসূতি মায়েদের প্রসবের সময় Labour Room-এ, অস্ত্রোপচার বা ভিতরে নল ঢুকিয়ে কোনো পরীক্ষা করার সময় (যেমন ল্যাপারোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি) এবং ডায়ালিসিস রোগীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি ঘটে। থ্যালাসেমিয়া বা রক্তের অন্য রোগের কারণে যাদের শরীরে বার বার রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion) করতে হয়— তাদের হেপাটাইটিস বি, সি এবং এইচ আই ভি/এইড্‌স-এ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

সংক্রমণের হার

উন্নত এবং উন্নয়নশীল— উভয় ধরনের দেশের হাসপাতালেই এই ধরনের সংক্রমণ ও তার ফলে রোগী মৃত্যুর ঘটনা অনেকেই ঘটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৪টি দেশের ৫৫টি হাসপাতালে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিল যে অন্তর্বিভাগে ভর্তি সমস্ত রোগীর ৮.৭% হাসপাতাল থেকে পাওয়া জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত। ২০০২-২০০৭ সাল পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন হাসপাতালের আই সি ইউ তে করা আর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে সংক্রমণের পরিমাণ ১০ % এরও বেশি। ২০০২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের সংক্রমণের (Healthcare Associated Infection বা HAI) মোট সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ এবং তার থেকে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ৯৯ হাজার মানুষের (প্রায় ৬ %)। এবং এই ধরনের সংক্রমণের ফলে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ হয় প্রায় চল্লিশ বিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২২ শো কোটি টাকা)।

শিশুদের সংকটজনক রোগে যেসব বিশেষ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয় (NICU/PICU) সেখানে প্রায় ১২-১৫ % শিশুর মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ দেখা গেছে। বিশেষত জন্মের সময় কম ওজনের বাচ্চা (১.৫ কেজির নিচে) অথবা জন্মের প্রথম সপ্তাহের

মধ্যেই যাদের ফুসফুসের প্রদাহ (Pneumonia) বা অন্যান্য কারণে কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালাতে হয়েছে (Ventilation) বা কোনো ধরনের নল (Catheter) শরীরে প্রবেশ করাতে হয়েছে— তাদের মধ্যে সংক্রমণ অনেক বেশি। একটি সমীক্ষায় ১,১০, ৭০৯টি আই সি ইউ (NICU) তে ভর্তি শিশুকে পরীক্ষা করে ৬২৯০ জনের মধ্যে নানা ধরনের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে বিষয়টি কত গুরুতর।

অন্যান্য বিভিন্ন দেশে হাসপাতাল থেকে পাওয়া সংক্রমণ নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। নিচের সারণিটি দেখুন—

দেশ	সংক্রমণের হার
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৮-১০ %
ফ্রান্স	৬.৭-৭.৪ %
ইতালি	৪.৯-৬.৭ %
সুইজারল্যান্ড	৪-১৪ %
ফিনল্যান্ড	৬-৮.৫ %

ভারতবর্ষে সারা দেশব্যাপী সমীক্ষার রিপোর্ট না থাকলেও পি জি আই (চন্ডীগড়)-এর প্রকাশিত একটি তথ্যে দেখা যাচ্ছে পুড়ে যাওয়া রোগীদের ৩৬.২%, বৃক্ক প্রতিস্থাপিত রোগীদের ৫৮ %, কৃত্রিম ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো হচ্ছে এমন রোগীদের ৩০.৭%, ফুসফুসের রোগীদের ১৫ % এবং ক্ষত (wound) আছে এমন রোগীদের ৯ % nosocomial Infection-এ আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি চারজন রোগীর একজন (২৫ %) এই ধরনের সংক্রমণে আক্রান্ত হন।

কী ধরনের জীবাণু থেকে সংক্রমণ হয়?

ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পরজীবী, অণুবীক্ষণিক ছত্রাক সব কিছু থেকেই সংক্রমণ হতে পারে। এমনকি সাধারণভাবে রোগ সৃষ্টি করে না, এমন সুযোগসন্ধানী (opportunistic) ও মানুষের শরীরে এমনিই বাস করে এমন মিথোজীবী (commensal) জীবাণুরাও রোগীর শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিতে পারে। শরীরের মধ্যে গলা, শ্বাসনালী , অন্ত্র, চামড়া বা যৌনাঙ্গে থাকা জীবাণুরাও তেড়েফুঁড়ে উঠে রোগ সৃষ্টি করে। তালিকা দীর্ঘ। সংক্ষেপে কয়েকটির নাম উল্লেখ করলাম। ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি, ছত্রাকের মধ্যে ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস, পরজীবির মধ্যে ম্যালেরিয়া ও অ্যান্টামিবা— এরা হাসপাতাল থেকে সংক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংক্রমণ বেশি হয়?

১। অস্ত্রোপচারের ক্ষত, সেলাইয়ের লাইন বা প্রাকৃতিক ক্ষত (যেমন Diabetic Foot Ulcer)।
২। প্রস্রাবের পথে (Urinary Tract Infection)।
৩। শ্বাসনালী ও ফুসফুস (Respiratory Tract Infection & Pneumonia)।
৪। অন্ত্র (Gastroenteritis)।
৫। মস্তিষ্কের আবরণীতে (Meningitis)।
৬। শিশুদের ক্ষেত্রে নাভিমূলে (Umbilical stump)।
৭। রক্তে ছড়িয়ে পড়া সংক্রমণ (Blood Stream Infection and Septicemia)।
এছাড়া অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গও আক্রান্ত হতে পারে।

ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, ভাইরাসের মধ্যে হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি, ছত্রাকের মধ্যে ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস, পরজীবির মধ্যে ম্যালেরিয়া ও অ্যান্টামিবা— এরা হাসপাতাল থেকে সংক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এই ধরনের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি সাহায্য করে—

ক. বয়স্ক রোগী বা শিশু।
খ. অস্ত্রোপচারের আগে বা পরে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা, মেডিক্যাল কারণে দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকা।
গ. ক্ষতে আগে থেকে সংক্রমণ।
ঘ. দীর্ঘদিন ধরে Ventilator যন্ত্রের নল শ্বাসনালীতে থাকা।
ঙ. প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথিটার পরানো রোগী।
চ. মধুমেহ।
ছ. দীর্ঘকালীন নানা রোগ। যেমন উচ্চ রক্তচাপ, হাঁপানি, বৃক্কের অসুখ।
জ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়েছে এমন রোগী (Immunosupressed)। যেমন এইচ আই ভি/এইড্‌স।
ঝ. অপুষ্টি।
ঞ. ক্যানসারের রোগী বা রেডিওথেরাপি/কেমোথেরাপি হচ্ছে এমন রোগী।
ট. দীর্ঘদিন স্টেরয়েড (Steroid) খাচ্ছেন এমন রোগী।
ঠ. প্রসবের পর মা— বিশেষত যাঁদের অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (Post partum haemorrhage) হয়েছে।

কীভাবে সংক্রমণ ছড়ায়?

১। হাঁচি, কাশির মারফৎ যাকে বলে droplet infection।
২। সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে।
৩। বাতাসের মাধ্যমে।
৪। হাসপাতালের খাবার, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় বা বিছানার মাধ্যমে।
৫। সংক্রামিত যন্ত্রপাতি, ড্রেসিং, গজ-তুলা-ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ, স্যালাইন বা রক্তের বোতল, ক্যাথিটার, নানা যন্ত্রের নল, থার্মোমিটার ইত্যাদির মারফৎ।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীবাণুর ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে অ্যান্টিবায়োটিকের নির্বিচারে প্রয়োগের ফলে বহু প্রতিরোধী (Multi-Drug Resistant) বহু ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়েছে। যেমন: Methicillin Resistant *Staph aureus* (MRSA), Vancomycin Resistant *Staph aureus* (VRSA) অথবা Vancomycin Resistant Enterococci (VRE)। এইসব জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ মারাত্মক।

সংক্ষেপে হাসপাতাল থেকে অসুখের আলোচনা হল। এর থেকে মুক্তির উপায়, কী কী সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার— সেসব আপনারা পাবেন অন্য প্রবন্ধে।

লেখক পরিচিতি: ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত এম বি বি এস, ডি সি পি, এম ডি (বায়োকেমিস্ট্রি),প্যাথোলজিস্ট। বায়োকেমিস্ট। এক সরকারি হাসপাতালে চাকরি করার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক অগ্রণী কর্মী।

হাসপাতালে সংক্রমণ : চিকিৎসা করাতে গিয়ে মৃত্যু!

জনমানসে হাসপাতাল হল এমন জায়গা যেখানে গেলে চিকিৎসার সাহায্যে মানুষ রোগ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সে কথাটা আর স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যাচ্ছে না, লিখছেন **সত্য শিবরামন**।

এক দশকের কিছু আগে আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন-এর জার্নালে (JAMA) জন হপকিন্স স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর ডা. বারবারা স্টারফিল্ড একটি পরিসংখ্যানে দেখান প্রতি বছর স্রেফ হাসপাতালে ভর্তি হবার কারণে আমেরিকাতে কত মানুষের মৃত্যু ঘটে।

- ১২,০০০ মানুষ মারা যান অকারণ অস্ত্রোপচারের ফলে।
- ৭,০০০ জন হাসপাতালে ভুল ওষুধ দেবার ফলে।
- ২০,০০০ জন হাসপাতালে অন্যান্য ভুলের ফলে।
- ৮০,০০০ জন হাসপাতালে সংক্রমণের ফলে।
- ১০৬,০০০ জন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়, যেখানে ওষুধ নির্বাচনে ভুল হয়নি।

বছরে মোট ২২৫,০০০ মৃত্যু: আমেরিকায় হৃদযন্ত্র ও রক্তনালী (Cardiovascular)সংক্রান্ত রোগ ও ক্যানসারের পরেই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল আয়াট্রোজেনিক অর্থাৎ চিকিৎসার ফলে উদ্ভূত রোগ, যেমন ওপরের তালিকায় দেখানো আছে।

ওপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে চিকিৎসার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন রোগের মধ্যে হাসপাতাল থেকে আসা জীবাণু সংক্রমণের গুরুত্ব খুব বেশি। এইসব হাসপাতাল থেকে আসা জীবাণু সংক্রমণের আরেক নাম হল 'নসোকমিয়াল (nosocomial) ইনফেকশন', আর কোনো রোগী হাসপাতালে বা ওইরকম কোনো ব্যবস্থায় (যেমন নার্সিংহোম) ভর্তি হবার ৪৮ ঘন্টার পর থেকে শুরু হওয়া সব জীবাণু সংক্রমণকে নসোকমিয়াল ইনফেকশন বলে ধরে নেওয়া হয়।

যদিও সঠিক নজরদারির অভাবে ভারতবর্ষে এইচ এ আই (HAIবা Hospital Acquired Infection)-এর উপর সংগৃহীত তথ্য খুবই ত্রুটিপূর্ণ, তবুও গ্লোবাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স পার্টনারশিপ (GARP) ইন্ডিয়া ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং সেন্টার ফর ডিজিজ ডায়নামিকস, ইকোনমিকস অ্যান্ড

পলিসি (CDDEP)-র একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় হাসপাতালগুলির ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এবং ওয়ার্ডে জীবাণু সংক্রমণের হার খুব বেশি এবং তার একটা বড় অংশ হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স।

''সিচুয়েসান অ্যানালিসিস: অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ অ্যান্ড রেজিস্টেন্স ইন ইন্ডিয়া'' শীর্ষক GARP বিবরণ বলছে, 'বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে সারা দেশের হাসপাতালে জীবাণু সংক্রমণ উদ্বেগজনক প্রবণতা দেখাচ্ছে। আই সি ইউ -তে ভ্যাঙ্কোমাইসিন রেজিস্টেন্ট এন্টারোকক্কাস, যেটি একটি ভয়ংকর সংক্রমণ তার হার, বাকি পৃথিবীর থেকে পাঁচ গুণ বেশি।

এই বিবরণ আরো বলছে, '' মেথিসিলিন রেজিস্টেন্ট স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস সংক্রমণের হার ভারতবর্ষের আই সি ইউ তে খুবই বেশি। একটি সমীক্ষা বলছে এরকম কিছু নমুনায় আশি শতাংশেরও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স পাওয়া গেছে।''

হাসপাতালে সংক্রমণের কারণ— এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র এই সংখ্যায় অন্য একটি প্রবন্ধে রয়েছে। এখানে এই কথাগুলি শুধু যোগ করা দরকার যে দি ইউনিভার্সিটি অফ মিচিগান হেলথ সিস্টেম জানিয়েছে তাদের হাসপাতালে সংক্রমণ সব থেকে বেশি হয় মূত্রথলির ক্যাথেটার, কেন্দ্রিয় শিরায় ক্যাথেটার (সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটার) এবং এন্ড্রোট্র্যাকিয়াল টিউব (যে নল মুখ দিয়ে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে)-এর মাধ্যমে। এই বিভিন্ন ক্যাথেটারের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বাইরে থেকে দেহে প্রবেশ করে রক্তে মেশার সুযোগ পায়।

ইনফেকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড হসপিটাল এপিডেমিয়লজি-র জার্নালে একটা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে শতকরা ২৪ ভাগ ক্যাথেটার করা রোগীর সংক্রমণ হয়, যার মধ্যে শতকরা ৫.২ ভাগ রোগীর রক্তপ্রবাহে সংক্রমণ হয়, আর শতকরা ৪ থেকে ২০ ভাগ রোগী এই সংক্রমণে মারা যান।

সাধারণ সংক্রমণ

মূত্রনালী সংক্রমণ বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হচ্ছে সব থেকে সাধারণ হাসপাতাল উদ্ভূত সংক্রমণ, যেটা মূত্রনালীতে ক্যাথেটার পরানোর জন্য হয়। ক্যাথেটারাইজেসান বলতে বোঝায় মূত্রনালী দিয়ে মূত্রথলিতে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে মূত্র নিষ্কাশন করা, বা কোনো ওষুধ মূত্রথলিতে প্রবেশ করানো, মূত্রের পরিমাণ মাপা বা অন্য কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার করা।

হাসপাতালে উদ্ভূত সংক্রমণের দ্বিতীয় স্থানে আছে নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহ। শ্বাসতন্ত্রের রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির জন্য খুব সহজে ব্যাকটেরিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। জীবাণুগুলি সংক্রামিত চিকিৎসা-সরঞ্জাম বা শ্বাসনালীতে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ— যেমন নল পরানো, মুখ বা গলা থেকে জমে থাকা ক্ষরিত পদার্থ শোষণ করার সময় বা যান্ত্রিক ভেন্টিলেশনের সময় অথবা স্বাস্থ্যকর্মীদের সংক্রামিত হাত থেকে আসতে পারে।

ইনভেসিভ সার্জিক্যাল পদ্ধতির দ্বারা ব্যাকটেরিয়ারা দেহের সংক্রমণহীন জায়গায় ঢোকার একটা রাস্তা খুঁজে পায়। এক্ষেত্রে সংক্রমণ চিকিৎসা সরঞ্জাম বা স্বাস্থ্যকর্মীদের হাত থেকে আসতে পারে।

শল্যচিকিৎসার পরে ক্ষতস্থানে সংক্রমণ হয় সংক্রামিত ড্রেসিং দ্রব্য থেকে অথবা স্বাস্থ্যকর্মিদের হাত থেকে। কিছু কিছু ক্ষত এমনিতেই সংক্রমণ-প্রবণ হয়— যেমন চোট থেকে উদ্ভূত ক্ষত, পোড়া ক্ষত, দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকলে বা হুইলচেয়ারে বসে থাকলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত চাপের ফলে তৈরি ক্ষত।

হাসপাতালে ভর্তি অনেক রোগীরই শিরার মাধ্যমে ওষুধ দেওয়া, স্যালাইন দেওয়া বা তরল পুষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একটা অন্তঃশিরা ক্যাথেটার (ইন্ট্রাভেনাস ক্যাথেটার) এই সব রোগীদের শিরায় ঢুকিয়ে রাখা হয়। আর এর মাধ্যমে ওষুধ, রক্ত বা রক্তের অন্যান্য উপাদান অথবা তরল পুষ্টিদ্রব্য রক্তে পাঠানো হয়। আর তখন আশপাশ থেকে, চিকিৎসা সরঞ্জাম থেকে বা স্বাস্থ্যকর্মীদের হাত থেকে এই ক্যাথেটারের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া দেহে প্রবেশ করে। যত বেশিদিন এটা রাখা হয় সংক্রমণের সম্ভাবনা তত বেশি থাকে।

অন্যান্য যে সমস্ত পদ্ধতির জন্য 'নসোকমিয়াল ইনফেকশন' বা হাসপাতাল উদ্ভূত সংক্রমণ হতে পারে সেগুলো হচ্ছে— গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল বা জঠরান্ত্রিক, ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত কোনো পরীক্ষা প্রণালী বা ডায়ালিসিস।

কিভাবে প্রতিরোধ করা যাবে?

হাসপাতালে উদ্ভূত সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য হাসপাতালগুলি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন :

●একটি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যাতে করে পরীক্ষা-প্রণালীগুলির গুণমান বজায় রাখা যায় এবং সংক্রমণের হার কমছে না বাড়ছে তার উপর একটা নজরদারি করা যায়।

●২০০ বেড পিছু একজন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা।

●অধিক ঝুঁকির পরীক্ষা-প্রণালীগুলি বা অন্যান্য সংক্রমণের উৎসগুলি চিহ্নিত করণ।

●স্বাস্থ্যকর্মী এবং রোগীর দর্শনার্থীদের হাত ধোওয়া বাধ্যতামূলক করা যাতে করে এঁদের দেহ থেকে কোনো রোগীর বা এক রোগী থেকে আর এক রোগীর সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

●গাউন, গ্লাভস, মুখোশ বা অন্যান্য শল্যপদ্ধতির প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলির নির্বীজকরণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

●পুনর্ব্যবহারযোগ্য যেকোনো চিকিৎসা সরঞ্জাম যেমন ভেন্টিলেটার, হিউমিডিফায়ার বা অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের নির্বীজকরণ ভালো ভাবে করা।

●ক্ষতস্থানের ড্রেসিং বার বার পরিবর্তন করা এবং অ্যান্টিব্যাক্টিরিয়াল মলম ব্যবহার করা।

●যত দ্রুত সম্ভব নেসোগ্যাস্ট্রিক (নাক থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত) এবং এন্ড্রোট্র্যাকিয়াল (মুখ থেকে শ্বাসনালী পর্যন্ত) টিউব খুলে ফেলা।

●অ্যান্টিবায়োটিকের প্রলেপ দেওয়া অন্তঃশিরা ক্যাথেটার ব্যবহার করা যাতে রক্তপ্রবাহে মেশার আগেই ব্যাকটেরিয়াগুলি ধ্বংস হয়।

●মুখোশ ও অন্যান্য বাধাদানকারী জিনিস (বেরিয়ার) ব্যবহার করা যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষরণের সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে না আসেন।

●রূপোর সংকর ধাতুর প্রলেপ দেওয়া মূত্রথলির ক্যাথেটার ব্যবহার করা যাতে ব্যাকটেরিয়া মূত্রথলিতে যাবার আগে ধ্বংস হয়।

●অধিক ঝুঁকির পদ্ধতি যেমন মূত্রথলির ক্যাথেটার

ওষুধ-প্রতিরোধী জীবাণুর উদ্ভব ঠেকাতে হলে

হাসপাতালে মানুষ যান রোগ সারাতে। এক রোগ সারাতে গিয়ে অন্য রোগ— হাসপাতাল থেকে পাওয়া জীবাণু সংক্রমণ। আসলে এর একটা বড় কারণ জীবাণুনাশকের নিয়ম না মানা ব্যবহার। কী হওয়া উচিত জীবাণুনাশকের ব্যবহার? **— ডা. পুণ্যব্রত গুণ-এর সম্পাদকীয় সংযোজন**

জীবাণুগুলো ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে। জীবাণুনাশক ওষুধের ব্যবহার এই প্রতিরোধ সৃষ্টির একটা কারণ। কিন্তু জীবাণুনাশক ব্যবহার না করেও তো চলা যায় না। তবে জীবাণুনাশক ওষুধ যথাযথ ভাবে ব্যবহার করলে জীবাণুনাশকের প্রতি জীবাণুর প্রতিরোধ-সৃষ্টির বিষয়টা অনেকটা পিছিয়ে দেওয়া যায়। আর যখন প্রতিরোধ তৈরি হয়ে গেছে তখন প্রতিরোধী জীবাণু-সংক্রমণের ঘটনাও কমানো যায়।

জীবাণুনাশক ব্যবহারের সাধারণ নীতিমালা

- কেবল তখনই জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন, যখন তা ব্যবহার করে লাভ হবে এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত।
- দু'ধরনের জীবাণুনাশক আছে— কম বিস্তৃতির (narrow spectrum), যেগুলো নির্দিষ্ট কম কিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে; এবং বড় বিস্তৃতির (broad spectrum), যেগুলো অনেক ধরনের জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। কোন জীবাণুতে সংক্রমণ হয়েছে তা জেনে বা আন্দাজ করে কম বিস্তৃতির জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
- সাধারণ ভাবে একাধিক জীবাণুনাশক একসঙ্গে ব্যবহার না করে একটা ব্যবহার করুন।
- জীবাণুনাশকের মাত্রা ততটা বেশি হওয়া চাই যাতে তা কার্যকরী হয় এবং জীবাণুকে ওষুধ-প্রতিরোধ করতে না দেয়। আবার মাত্রা যেন এমন না হয় যাতে বিষক্রিয়া হয়।

জীবাণু-সংক্রমণের চিকিৎসা

- কোন জীবাণুনাশক দেবেন তা কালচার-সেন্সিটিভিটি পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভর করে ঠিক করা ভাল।
- কালচার-সেন্সিটিভিটির সুযোগ না থাকলে সেই অঞ্চলে এ ধরনের জীবাণু-সংক্রমণ কোন জীবাণু থেকে হয় এবং তা কোন কোন ওষুধে প্রতিরোধী— এই তথ্যের ভিত্তিতে ওষুধ নির্বাচন করা উচিত।
- যত কম দিন সম্ভব জীবাণুনাশক প্রয়োগ করুন। সাধারণ ভাবে ৭ দিনের বেশি নয়। কোনো ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ থাকে যে কম দিনে অসুখ সারবে না তাহলে অবশ্য কথা আলাদা (যেমন যক্ষ্মা-সংক্রমণ, এতে ন্যূনতম ৬ মাস ওষুধ ব্যবহার করতে হয়)।

জীবাণু-সংক্রমণ ঠেকাতে জীবাণুনাশকের ব্যবহার

- কোন জীবাণু দিয়ে সংক্রমণ হতে পারে সে সম্পর্কে জ্ঞানের ভিত্তিতে জীবাণুনাশক নির্বাচন করুন।
- যত কম দিন ব্যবহার করা যায় তত ভাল। অপারেশনের সময় জীবাণু-সংক্রমণ ঠেকাতে মাত্র একটা মাত্রা দেওয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথেষ্ট। যদি বেশি দিন ধরে জীবাণুনাশক দিলে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে লাভ হবে এমন প্রমাণ থাকে তাহলে অবশ্য বেশি দিন ব্যবহার করা যায়।

ব্যবহারের সংখ্যা ও সময় ন্যূনতম রাখা।

●সংক্রামিত রোগীকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা।

●চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সঠিক ভাবে নির্বীজ করা।

●অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সঠিকভাবে কমানো যাতে রোগীর নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে এবং রেজিস্টেন্ট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমাতে পারে।

হাসপাতালের নকশা এবং স্থাপত্য

হাসপাতালের স্থাপত্যের নকশা বদলে দিয়ে কিভাবে সংক্রমণ কমানো যায় সে বিষয়ের উপর বর্তমানে খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুটি খাটের মধ্যবর্তি যথাযথ দূরত্ব, ঘরগুলিতে হাওয়া বা বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা গেছে হাসপাতালে উদ্ভূত সংক্রমণ বা নসোকমিয়াল ইনফেকশন মূলত তিনটি পথে ছড়ায়— হাওয়া, সংস্পর্শ এবং জল। হাসপাতাল বিল্ডিং বা বায়ুশোধন ব্যবস্থার সংস্কার করার সময় ধুলোবালি ও অন্যান্য রোগকারক (pathogen) পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বায়ুবাহিত সংক্রমণ ঘটাতে পারে। হাসপাতালে সঠিক গুণমানের বাতাস প্রবাহিত করার দুটি শর্ত হচ্ছে— বায়ু পরিশ্রুত করে পাঠানো এবং অন্তর্বিভাগে বায়ুশোধন যন্ত্রের মাধ্যমে দূষণমুক্ত বায়ু প্রবাহিত করা। হাই এফিসিয়েন্সি পার্টিকুলেট এয়ার বা HEPA পরিশ্রুতকরণ পদ্ধতি হাসপাতালে ব্যবহার করে বায়ুবাহিত সংক্রমণের হার খুব কার্যকর ভাবে রোধ করা যায়।

হাত ধোয়ার অনিচ্ছার জন্যে ডাক্তার ও নার্সদের হাত থেকে একটা বড় অংশের নসোকমিয়াল ইনফেকশন হয়। দেখা গেছে হাত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা যেমন অ্যালকোহল রাব বা হাত ধোয়ার বেসিন প্রচুর সংখ্যায় বাড়িয়ে দিলে হাত ধোয়ার প্রবণতা বাড়ানো যায়।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় বলে বিশেষজ্ঞরা এক শয্যার ঘরের সুপারিশ করেছেন। রোগীর ছুটির পরে রোগকারক জীবাণু চিহ্নিতকরণ এবং নির্বীজকরণ করা অনেক সুবিধাজনক হয়। জলবাহিত সংক্রমণ হয় সরাসরি সংস্পর্শে, দূষিত জল খাওয়া এবং দূষিত জলের উৎস থেকে বাষ্পকণার মাধ্যমে শ্বাসের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে। জল সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা করা, পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করলে জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়— যেমন Legionnaires disease নিয়ন্ত্রণ।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে হাসপাতালের নির্মাণ ব্যবস্থা হাসপাতালের সংক্রমণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই হাসপাতালের সঠিক নকশা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার সযত্ন নির্মাণ হাসপাতালের সংক্রমণ বহুলাংশে কমিয়ে আনতে পারে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রিকরণ

আর একটি চিন্তা পরীক্ষামূলক স্তরে আছে— সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রিকরণ— যাতে করে হাসপাতালের মতো বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন কমে যায়। ভাবা হচ্ছে এর বদলে অনেকগুলি ছোট ছোট সামাজিক কেন্দ্র তৈরি করা যেখানে সর্বাধুনিক চিকিৎসা-প্রযুক্তির ব্যবস্থা থাকবে এবং একসঙ্গে রোগীর বাড়ির লোক এবং অন্যান্য মানুষের অংশগ্রহণ বেশি থাকবে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন আমরা যেভাবে হাসপাতাল দেখতে অভ্যস্ত, ভবিষ্যতের হাসপাতাল সেরকম থাকবে না। হাসপাতাল হবে এমন একটা মধ্যমণি যার জাল বিকেন্দ্রায়িত ভাবে বিস্তৃত থাকবে অনেক দূর পর্যন্ত। রোগীদের পরিষেবা শুধু এই হাসপাতালে নয়, স্থানীয় হাসপাতালে এমনকি রোগীর বাড়িতেও দেওয়া হবে। বলা যেতে পারে এটা খুব সম্ভবত একটা সীমানাহীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। এরকম ভাবা হচ্ছে ভবিষ্যতে হাসপাতালের সাধারণ কাজকর্মগুলি রোগীর নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ পরিষেবার জন্য অন্য একটি স্থান থাকবে।

এ রকম বিকেন্দ্রায়িত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা টিঁকে থাকতে পারে যদি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যজ্ঞান বাড়ানো যায় যাতে তাঁরা প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে এটা সম্ভব হবে যদি স্কুলে শুশ্রূষাবিদ্যা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করা যাতে তাঁরা স্বেচ্ছায় এই শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কিন্তু এ রকম বিকেন্দ্রায়িত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রায় স্বাস্থ্যকর্মী করে তুলে হাসপাতালে উদ্ভূত সংক্রমণ রোধ করতে হলে এখনো অনেক পথ হাঁটতে হবে। তাছাড়া এ রকম বিকেন্দ্রায়িত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটাও একটা প্রশ্ন। স্বাস্থ্য জ্ঞান সম্পর্কে বিতর্ক সভা ডেকে, প্রয়োজনে গণআন্দোলনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

পরিশেষে

Hospital কথাটা এসেছে Hospice থেকে। আগে হাসপাতাল বলতে বোঝানো হত এমন একটা জায়গা যেখানে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব মানুষ আসতেন শান্তিতে মরার জন্য। বর্তমানে হাসপাতাল থেকে সংক্রমণ এবং চিকিৎসাজনিত রোগে মৃত্যুর হারের চরম বৃদ্ধি যেন সেই পুরানো অর্থ পরিহাস করে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক এবং সমাজবিদ মিশেল ফুকো (Foucault) দেখিয়েছেন হাসপাতালকে চিকিৎসা ও সুস্থতার জায়গা হিসাবে দেখা শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকে। এটা হচ্ছে সেই সময় যখন ইউরোপের কিছু অংশে মিলিটারি এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যজীবীরা তাঁদের আহত যোদ্ধা এবং উপনিবেশ ফেরত অসুস্থ ধনী সওদাগরদের চিকিৎসাস্থল হিসাবে এই হাসপাতালগুলিকে ব্যবহার করতে শুরু করেন।

হাসপাতালের এই প্রাতিষ্ঠানিক চেহারায়, যেখানে ডাক্তাররা তাঁদের পেশাদারী দক্ষতা প্রয়োগ করেন এবং সাধারণ মানুষও এটাকে চিকিৎসাস্থল হিসাবে ভাবেন, বিবর্তিত হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। কিন্তু কেবলমাত্র হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার জন্য মৃত্যুর যে মিছিল দেখা যাচ্ছে তাতে করে হাসপাতালের এই ভাবমূর্তি চিরকালের মতো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

হাসপাতালে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের বিষয়টি মানুষের জীবনের একটা বড় বিপদ— এই বিষয়টিকে সামনে রাখলে হয়তো ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয় ভাবনা ও প্রদানে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

লেখক পরিচিতিঃ সত্য শিবরামন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা, সাংবাদিক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের এক কর্মী। তাঁকে যোগাযোগ করার ই-মেল ঃ sagarnama@gmail.com

অনুবাদক পরিচিতি ঃ অনুবাদক ডা. সুমিত দাশ, এম বি বি এস, ডি পি এম, মনোরোগবিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। তা ছাড়াও যুক্ত আছেন শ্রমজীবি মানুষদের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য গড়ে ওঠা একটি ক্লিনিকের সাথে।

এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প

এদেশের গ্রামে চিকিৎসা পরিষেবার হাল খুব খারাপ। সরকারি যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র-গ্রামীণ হাসপাতাল আছে সেখানে ওষুধ যন্ত্রপাতি কিছুই নেই— আছে শুধু জঞ্জালের স্তূপ। শহরের মাঝখানে মেডিকেল কলেজে বসে পাঁচ-দশ বছর পড়াশুনা করে যখন নতুন ডাক্তারেরা গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন অনেকেই পালাবার পথ পান না। তবে সকলেই তো পালাবার লোক নন, তাঁরা শেষ অবধি না দেখে ছাড়েন না— সেই দেখার আর বাঁচার সত্যি কাহিনী শোনাচ্ছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত**।

[আগে যা জেনেছি ঃ এই সংখ্যায় 'এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প'-এর তৃতীয় কিস্তি। প্রথম দুই কিস্তিতে আমরা শুনেছি আদ্যোপান্ত 'কলকাতার ছেলে' অনিরুদ্ধ মেডিকেল কলেজে বছর-আষ্টেক ধরে পড়াশুনো আর শিক্ষানবিশি করার পর দিল্লিতে বড় হাসপাতালের আরামের চাকরি ছেড়ে কিরকম হঠাৎ করেই সে ১৯৯০ সালে রাজ্য সরকারের চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে ৭৬ কিলোমিটার দূরে, ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি পান্ডববর্জিত পাড়াগাঁ বেলপুকুরে গেঁড়ে বসল।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ভাঙাচোরা, সাপের আড্ডা। সুতরাং অন্য একটা কোয়ার্টারে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করে ফেলতে হল। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ট্রান্সফর্মার আছে, স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড অফিসের কর্তারা নিয়ম দেখিয়ে খালাস। সুতরাং প্রায় গায়ের জোরে ট্রান্সমিটার থেকে লাইন টেনে হাসপাতালে ইলেকট্রিক কানেকশন আনতে হল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ওষুধ-বিষুধ আনতে গিয়ে জেলার প্রধান মেডিকেল অফিসের বাবুরা প্রায় সব ওষুধ 'সাপ্লাই নেই' লিখে দিলেন। অথচ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যা ওষুধ ছিল সেটা দিয়ে মানুষ বাঁচানোর চাইতে মারা সহজ।

এইসবের মধ্যেও রোগী দেখা আর রোগ সারানোর ফলে টুকটাক করে রোগী বাড়তে লাগল। রোগীরা ডাক্তারকে ভালোবেসে ফেললেন। অন্যদিকে ডাক্তার যেটুকু সামান্য যন্ত্র আর সুবিধা হাতের কাছে আছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে, কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানকে মাথায় রেখে, যেসব সার্জারি শুরু করলেন তাদের কথা কোনো বইতে লেখা নেই, কিন্তু ঐপরিস্থিতিতে রোগীকে বাঁচানোর সেটাই উপায়। শুরুতে ছিল খালি বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন— এমনিতে রুটিন ব্যাপার, কিন্তু গ্রামের হাসপাতালে সামান্যতম ব্যবস্থা থাকে না, আর রোগী ভোগে অপারেশন পরবর্তী জীবাণু সংক্রমণে। অনিরুদ্ধের স্ত্রী কনীনিকা পাশের এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এসে যোগ দিলেন, আর সংক্রমণ রুখতে রাত জেগে সেখানকার উপযোগী ব্যবস্থা ভেবে বের করে সেটা কার্যকর করা হল। অন্য হাসপাতাল-ফেরত অপারেশন রোগী প্রথমে বাধ্য হয়ে, তারপর প্রায় জোর করে, বেলপুকুরে বেশ বড় অপারেশন করিয়ে ছাড়ল। আর এইভাবে অনেকের প্রাণ বেঁচে গেল যা চলতি হাওয়ার পন্থী ডাক্তাররা ভাবতেই পারতেন না— অথচ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মূল নীতি থেকে সরে আসা হল না কোথাও। মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন, আস্থা রাখলেন, আর ভালোবাসলেন ডাক্তারের জীবন-বাঁচানো পাগলামোগুলো। হাসপাতাল কর্মী আর গ্রামের মানুষ চাঁদা তুলে জেনারেটর ভাড়া করে অপারেশন চালু রাখলেন। নিজের উদ্যোগে কেরোসিনের ব্যবস্থা করলেন এক স্থানীয় মানুষ।]

বিশাখা নিয়োগী, বয়স তেত্রিশ, পেটে ব্যথা নিয়ে এলেন আমার কাছে, বেলপুকুর হাসপাতালের আউটডোরে। আমি দেখলাম পিত্তথলিতে পাথর হয়েছে, অপারেশন করতে হবে। ছোট আর মাঝারি মাপের কিছু অপারেশন করছিলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে, অর্থাৎ জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে অপারেশনের ব্যবস্থা ছিল না— না ছিল যন্ত্রপাতি, না ছিল অজ্ঞান করার ডাক্তার (অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট)। সুতরাং তাঁকে পাঠালাম ডায়মন্ডহারবারে। আগেই বলেছি ডায়মন্ডহারবার সরকারি হাসপাতালে অপারেশন করাতে গিয়ে অনেক হয়রান হতে হত, রোগীকে বহুবার ঘুরতে হত। বিশাখাদের পরিবার মোটামুটি স্বচ্ছল, সুতরাং তাঁরা আর সরকারি হাসপাতালের পথ মাড়ালেন না, সোজা ভর্তি হলেন এক নার্সিংহোমে। সেখানকার ডাক্তারবাবু বললেন— ভারি ভয়ের অপারেশন, খুব বিপদ হতে পারে, তবে কিনা তিনি আছেন, সেরা সব জিনিস আর ওষুধ-টষুধ জোগাড় করে অপারেশন করবেন... ইত্যাদি ইত্যাদি। আসল কথাটা হল, রোগীর বাড়ির লোককে যত বড় অপারেশন বলে বোঝানো যাবে বিলের মাপটা তত বড় করা যাবে। কিন্তু ফল হল বিপরীত, বিশাখা বেঁকে বসলেন, অমন ভয়ংকর অপারেশন তিনি করাবেনই না। নার্সিংহোম থেকে

> রোগীর বাড়ির লোককে যত বড় অপারেশন বলে বোঝানো যাবে বিলের মাপটা তত বড় করা যাবে।

পালিয়ে এলেন তিনি, এবং তারপর সোজা আমার আউটডোরে। অপারেশন না করে উপায় যখন নেই, তখন আমাকেই সেটা করতে হবে। কিছুদিন আগে ওনার বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন আমাকে করতে হয়েছিল লোকাল অ্যানাস্থেসিয়ায়; খুব ঘাবড়ে গিয়ে ভরসা খুঁজছিলেন, আর তাই আমাকেই বলছিলেন— ডাক্তারবাবু একটু কথা বলুন, নইলে বড্ড ভয় করছে। খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয় কিন্তু, ভূতের ভয় পেলে যেমন লোকে নিজেদের মধ্যে জোরে জোরে কথা বলে ভয় তাড়ায়, সেরকম ব্যাপার। তা আমার আর অসুবিধে কি, এটা সেটা নানা কথা বলতে বলতে দিব্যি ছোট অপারেশনটা করে ফেললাম। সেই থেকে বিশাখাদেবীর ধারণা আমার কাছে অপারেশন করালে 'ভয় নেই'। আমি একটু কিন্তু কিন্তু করছিলাম, তবে সুলেমান-আশিসদের প্রবল উৎসাহ আর আমার উপরে ওদের অগাধ ভরসার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, পেরে যাব। আশিসকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অর্থাৎ জেনারেল অ্যানাস্থেসিয়া করার দায়িত্ব দেব ঠিক করলাম, আর সেজন্য তালিম দিতে শুরু করলাম। ওপেন ইথার অ্যানাস্থেসিয়া পদ্ধতিতে অজ্ঞান করা হবে। এই

পদ্ধতিতে খুব গভীর ভাবে অজ্ঞান না করা গেলেও, খুব নিরাপদ বলে যেখানে প্রশিক্ষিত অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট নেই সেখানে এটাই সুবিধাজনক। আমি রাজী হতেই এক সপ্তাহের মধ্যেই রোগীর স্বামী কলকাতা থেকে প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য জিনিসপত্র এনে জমা দিলেন। আমাকে সাহায্য করবে আমার স্ত্রী কনীনিকা আর সুলেমান। এই অপারেশনের আগের দু-তিন সপ্তাহ ধরে সুলেমানকে সব ছোটখাটো অপারেশনে আমার সাহায্যকারী হিসেবে নামাতাম আর সামান্যতম ভুল হলেই প্রচন্ড বকতাম— ওটাই ওর 'ট্রেনিং'। কনীনিকা তখন কাকদ্বীপ গ্রামীণ হাসপাতালে পোস্টেড, ওখানে ছ-জন ডাক্তার, সুতরাং টানা কয়েকদিন ডিউটি করে দিলে এক-দুদিন অফ পাওয়া যেত। ওর এইরকম এক ছুটির দিনে অপারেশনের তারিখ ফেলা হল।

সেই দিন অপারেশন থিয়েটারে আমিই একমাত্র লোক যে কিনা কোনোদিন পিত্তথলির অপারেশন দেখেছে ও করেছে। কনীনিকা মেডিকেল কলেজে শিশু-মেডিসিন বিভাগে কাজ করেছে, তাই পিত্তথলির অপারেশন দেখেছে বটে কিন্তু কখনও নিজে হাত লাগায় নি। আর বাকিরা তো পিত্তথলি কেমন দেখতে হয় সেটাই জানে না। অপারেশনটা করতে সময় একটু বেশিই লাগল। অনভ্যস্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট, আনপড় অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট— তাই আমাকে সবদিকেই খেয়াল রাখতে হচ্ছিল। ঘন্টাদেড়েকের মধ্যে অপারেশন শেষ করে রোগীকে নির্ধারিত বিছানায় নিয়ে গেলে আমরা তখনকার মতন নিশ্চিন্ত হলাম। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই সবরকমের নল, স্যালাইন ইত্যাদি খুলে দিয়ে প্রায় স্বাভাবিক খাবার শুরু করে দেওয়া গিয়েছিল। অপারেশনের তৃতীয় দিনে পেটের মধ্যে রবারের ড্রেনটাও বের করে দিলাম। দশদিন পরে সেলাই কেটে দিলে রোগী বাড়ি চলে গেলেন! মেডিকেল কলেজে কাজ করার সময়ে আমি এই মাপের অপারেশন করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে থাকতেন অন্য হাউসস্টাফরা, আর পরামর্শ দেওয়ার জন্য ইমারজেন্সি সার্জেন। সর্বোপরি থাকতেন দক্ষ অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট। অবশ্য পরের দিকে বেলপুকুরে এইসব 'অশিক্ষিত' অ্যাসিস্ট্যান্টরাও সব পোক্ত হয়ে উঠেছিল— এমনই দক্ষ যে কোনো অপারেশনই তাদের সাহায্যে করে ফেলতে অসুবিধা হত না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যথাযথ অ্যানাস্থেসিয়ার যন্ত্র, আর দক্ষ, নির্ভরযোগ্য অ্যানাস্থেসিওলজিস্টের অভাবটা মেটাবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নি; কিন্তু সেটা পরের কথা।

যাহোক, এক মাস বাদে বিশাখা আমাকে দেখাতে আসলেন একটা গাড়ি ভাড়া করে— সঙ্গে একটা অত্যন্ত ভালো ক্যারম বোর্ড! বিশাখার স্বামী খেয়াল করেছিলেন যে প্রত্যেকদিন রাতে আমরা জেগে থাকার জন্য কাছের একটা ক্লাব থেকে ক্যারম বোর্ডটা ধার করে নিয়ে আসতাম।

বড় অপারেশন ছোট ব্যবস্থা

বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন নিয়মিত চালু হয়ে যাওয়ার পরে কয়েকটা সমস্যা দেখা দিল। এই জাতীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী ভর্তি রাখার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না— না ছিল জায়গা, না ছিল পথ্যের ব্যবস্থা; আর নার্স মাত্র একজন। নার্স দিদিমণি আবার ছানির জন্য প্রায় কিছুই দেখতে পেতেন না, যদিও আঁকাবাঁকা একটা সই করতে পারতেন। নার্স থেকেও না থাকার অসুবিধাটা অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যেই সমাধান হয়ে গিয়েছিল। বেশির ভাগ বন্ধ্যাত্বকরণের রোগীর সাথে সেই গ্রামেরই দাইমা'রা আসতেন— শুশ্রূষা করার জন্য আর মায়ের সঙ্গে আসা ছোট শিশুদের সামলাতে। এই দাইমাদের থেকে বিশেষ করে তিনজন কনীনিকা আর আমার চোখে পড়েছিল। রঞ্জিতা, কমলা আর সিন্ধু— তিন জনেরই রোগী সেবা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল আর তার সঙ্গে ছিল শেখার প্রবল ইচ্ছা। ওরা নিজেদের রোগীদের দেখাশোনা করার সাথে সাথে অন্য রোগীদেরও দায়িত্ব নিত। নিজেরাই সময় করে সেইদিন ব্যবহার করা কাট-সীট, মপ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সকাল হবার আগেই ধুয়ে রাখত, যাতে পরের দিন অপারেশনের কাজে সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। ওদের মধ্যে কেউই স্কুলের গন্ডি পার করে না থাকলেও ধীরে ধীরে রোগীদের ওষুধগুলো যথাসময়ে খেতে দেওয়া, স্যালাইনের বোতল পাল্টানো— এসব প্রাথমিক কাজগুলো শিখে গেল। এমনকি বন্ধ্যাত্বকরণ, হার্নিয়া আর অন্যান্য ছোটোখাটো অপারেশনে কি কি যন্ত্রপাতি লাগে তাও রঞ্জিতা আর কমলা শিখে নিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যেই এই তিনকন্যা এতই দক্ষ হয়ে উঠল যে বেলপুকুর হাসপাতালে আর নার্সের অভাব বোধ হত না। হাসপাতাল থেকে ওরা কোনো টাকা পয়সা পেত না, অবশ্য রোগীর বাড়ির লোকেরা কিছু টাকা দিত তাদের রোগীদের দেখভাল করার জন্য।

পরের দিকে বেলপুকুরে এইসব 'অশিক্ষিত' অ্যাসিস্ট্যান্টরাও সব পোক্ত হয়ে উঠেছিল— এমনই দক্ষ যে কোনো অপারেশনই তাদের সাহায্যে করে ফেলতে অসুবিধা হত না।

রোগীদের পথ্য বা খাবার নিয়ে সমস্যাটার সরকারি সমাধান করার কোনো চেষ্টা আমি করিনি কারণ সরকারি খাদ্যসরবরাহকারীদের ওপর আমার কোনোই ভরসা বা বিশ্বাস ছিল না। হাসপাতালের উল্টোদিকে কয়েকটা দোকান ছিল, তারাই নিজেদের ব্যবসার খাতিরে বন্দোবস্ত করতে শুরু করে দিল। অপারেশনের দিনে দোকান চব্বিশ-ঘন্টাই খোলা, কারণ রোগীদের দরকার না হলেও আমার যেকোনো সময়ে চা খেতে ইচ্ছে করতে পারে। অপারেশনের পরে রোগীদের থাকার সমস্যাটার সমাধান অনেক ভাবনা-চিন্তা করে খুঁজে পাওয়া গেল, তবে তার

জন্য মেডিকেল কলেজের মাস্টারমশাইদের শেখানো চিরাচরিত অভ্যাসটাকে বিসর্জন দিতে হল। ঠিক করলাম যে স্থানীয় অবেদন অর্থাৎ লোকাল অ্যানাস্থেসিয়াতে অপারেশন করা রোগীদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেব। যেমন হার্নিয়া, টিউবেক্টমি, ছোটোখাটো টিউমার ইত্যাদি। পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েক সপ্তাহ এইসব রোগীদের অপারেশনের পরের দিনই বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দেখলাম— কোনো অসুবিধা তো হলই না, বরং রোগীর বাড়ির লোকেরাও খুব খুশি নতুন এই ব্যবস্থায়।

প্রতি সপ্তাহে, অপারেশনের পরের দিন ভোর থেকে দেখা যেত অনেকগুলো রোগী একটু বেঁকেচুরে বা বাড়ির লোকের হাত ধরে ধীরে ধীরে হাঁটাহাঁটি করছে। হাসপাতালের ভিতরে বাসুদেব বা সুলেমানের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে অন্য রোগীদের হাঁটতে বলার জন্য। একটু বেলা বাড়লেই, হাসপাতালের সামনে ভ্যান-রিক্সার লাইন। ছুটি হওয়া রোগীরা বাড়ি যাবে। দুপুরের মধ্যে হাসপাতালের ইনডোর প্রায় খালি— শুধুমাত্র অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, হিস্টেরেক্টমি ইত্যাদি একটু বড় অপারেশনের রোগীরা ছাড়া আর কোন রোগী নেই। তখনও আমি এই 'বড় অপারেশন'-এর রোগীদের একেবারে সেলাই কাটার পরেই ছুটি দিতাম। অন্যদের

> পেশাদারী নার্সদের তুলনায় বেশীর ভাগ বাড়ির লোক সমান নিপুণতা আর অনেক ক্ষেত্রে বেশি নিষ্ঠার সাথে রোগীর শুশ্রূষা করেন।

তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়ার ফলে অবশ্য আমার একটা কাজ বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিটি রোগীকে বাড়ি পাঠাবার আগে আমি নিজের হাতে তাদের ড্রেসিংটা পালটে দিতাম আর ছুটির কাগজে লেখা পরামর্শগুলো বুঝিয়ে দিতাম। বেশ কিছুটা সময় লাগলেও এই দায়িত্ব আমি কোনদিন অন্য কাউকে দিইনি। মাস দুয়েকের মধ্যেই বোঝা যেতে লাগল যে বাড়িতে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, অথবা হয়ত সেই জন্যেই, সেলাইয়ের জায়গায় বীজাণু-সংক্রমণের (ইনফেকশনের) হার অভাবনীয় রকমের কম। আর আমার একটা নতুন উপলব্ধি হল— পেশাদারী নার্সদের তুলনায় বেশীর ভাগ বাড়ির লোক সমান নিপুণতা আর অনেক ক্ষেত্রে বেশি নিষ্ঠার সাথে রোগীর শুশ্রূষা করেন। আমি কিন্তু এটা বলছি না যে বাড়ির লোক সমান দক্ষ, কিন্তু বাড়িতে তো ইঞ্জেকশান দেওয়া বা স্যালাইনের ড্রপের হিসেব রাখার দরকার হয়না, সেখানে যাতে রোগী ঠিকঠাক বিশ্রাম নেন আর ক্ষত পরিষ্কার রাখেন, ও নিজের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন— এটুকুই দরকার। ভাল করে বুঝিয়ে দিলে সেটা বাড়ির লোক সুন্দর করতে পারেন, কেননা পেশাদারী নার্সের যেখানে

> ''ডে-কেয়ার সার্জারি''-র প্রচলন হয়েছিল অনেক ভাবনাচিন্তা করে— রোগীদের হাসপাতালে থাকার সময়টা কমানো আর সেই সঙ্গে হাসপাতাল-জনিত বীজাণু-সংক্রমণ তথা ইনফেকশন আটকাবার জন্য।

একসাথে অনেক রোগীকে সামলাতে হয় সেখানে তাঁরা সামলান একটিমাত্র রোগীকে, আর 'ডিউটি'-র চাইতে প্রাণের টানের জোর বেশি। এটা শুধু ওখানেই না, পরে আমার বাড়িতেও বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করেছি।

খাপছাড়া, কিন্তু খামখেয়াল নয়

কলকাতায় আসতাম শনিবার। সময় পেলেই চলে যেতাম ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে বই আর জার্নাল ঘাঁটতে। শ্রক সাহেবের বইটা ওখানেই আবিষ্কার করি। সেই সঙ্গে খুঁজে পাই ''ডে-কেয়ার সার্জারি'' নিয়ে কিছু প্রবন্ধ। ইংল্যান্ডে ''ডে-কেয়ার সার্জারি''-র প্রচলন হয়েছিল অনেক ভাবনাচিন্তা করে— রোগীদের হাসপাতালে থাকার সময়টা কমানো আর সেই সঙ্গে হাসপাতাল-জনিত বীজাণু-সংক্রমণ তথা ইনফেকশন আটকাবার জন্য। বই-জার্নাল পড়ে আশ্বস্ত হলাম যে সাহেবরা সকালে অপারেশন করে বিকেলে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের রোগীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন— তাহলে আমরা, নেটিভ'রা, পরের দিন রোগীদের ছুটি দিয়ে দিলে অতিবিজ্ঞ লোকেরা আপত্তি করবে না। আমি নিজে বুঝে গেছিলাম এইসব ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি ছুটি দিলে কোনও ক্ষতি নেই, বরং সুবিধা আছে; কিন্তু সাহেব কত্তারা ঘাড় কাত না করলে আমাদের ডাক্তারবাবুরা সহজে সায় দেন না। সাহেবরা কি করছেন সেটা না জেনেও বেলপুকুরে আমরা নিজেদের তাগিদেই যে ডে-কেয়ার সার্জারি চালু করে দিয়েছিলাম সেটা ভেবে আমার এখন অবাক লাগে। কথায় বলে প্রয়োজন থাকলে উপায় আবিষ্কার হয়ে যায় (Necessity is the mother of invention)-সেটা আবারও প্রমাণ হল। আর বই পড়ে ইংল্যান্ডে ''ডে-কেয়ার সার্জারি''-র খবরাখবর পাবার পর থেকে শুধু ছোটোখাটো অপারেশনের রোগীই নয়, অ্যাপেন্ডিসেক্টমি, হিস্টেরেক্টমি ইত্যাদির রোগীদের অপারেশনের পরদিনই বাড়ি পাঠাতে শুরু করলাম। এঁদের মধ্যেও বীজাণু-সংক্রমণ খুবই কম হত। সাতদিন বাদেই এঁরা দিব্যি হেঁটে চলে আসতেন সেলাই কাটাবার জন্যে। বাড়ির লোকেরা খুশি, খুশি আমরাও।

বেলপুকুর হাসপাতালে কোন অপারেশান থিয়েটার ছিলনা— ছিল একটা প্রসব ঘর, যার অধিকাংশ জানালাই অল্পবিস্তর ভাঙ্গা। যাঁরা বড় হাসপাতাল অথবা মেডিক্যাল কলেজে অপারেশান করে অভ্যস্ত, তাঁরা হয়ত বেলপুকুর হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটার দেখে আঁতকে উঠতেন, ভাবতেন যে এই নিম্নমানের অপারেশান থিয়েটারে বীজাণু-সংক্রমণ বা ইনফেকশান অবশ্যম্ভাবী। এই ভয়টা যে অমূলক সেটা আমরা রোগীদের সেলাই কাটার সময়েই বুঝতে পারতাম। মেডিক্যাল কলেজে কাজ করার সময়ে আমার দেখা বীজাণু-সংক্রমণ হারের থেকে বেলপুকুর হাসপাতালে বীজাণু-সংক্রমণ হার অনেকটাই কম ছিল। আমার কাছে পরিসংখ্যান নেই, সুতরাং এটা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু দু'জায়গাতে কাজ করে আমার অভিজ্ঞতা এটাই বলছে। এটা সম্ভব হয়েছিল ওখানকার প্রত্যেকটি কর্মীর, সরকারি বা বেসরকারি, নিষ্ঠা আর বীজাণুমুক্তকরণ (স্টেরিলিটি) সম্পর্কে

> মেডিক্যাল কলেজে কাজ করার সময়ে আমার দেখা বীজাণু-সংক্রমণ হারের থেকে বেলপুকুর হাসপাতালে বীজাণু-সংক্রমণ হার অনেকটাই কম ছিল।

সচেতনতার জন্য। দিনের পর দিন ওদের সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোওয়া থেকে শুরু করে সঠিক গ্লাভস পরার পদ্ধতি শেখাতে হয়েছিল— মনে পড়ে প্রথমদিকে ওদের একজনকে ১২ বার গ্লাভস খুলে নতুন করে পরতে বাধ্য করেছিলাম, স্টেরিলিটি বজায় রেখে গ্লাভস পরতে সে বারবার ভুল করছিল। বিশেষ করে অপারেশানের এলাকাতে স্টেরিলিটি বজায়

রাখার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হয়, কোনও আপোস চলে না— এটা ওরা বুঝে গেছিল। এছাড়া অপারেশানের আগের রাত্রে যন্ত্রপাতি গজ-ব্যান্ডেজ সব অটোক্লেভ করার কথা আগেই বলেছি।

রোগী বাড়ে, কিন্তু চিকিৎসার সরঞ্জাম?

যত দিন যাচ্ছিল, আউটডোরে রোগীর চাপও বাড়ছিল। দূরের থেকে অনেক রোগী আসতে শুরু করলেন বিভিন্ন রকম অপারেশানের জন্যে। শেষে টিউবেক্টমি ছাড়া অন্যান্য অপারেশানের জন্য একটা আলাদা দিন ঠিক করতে বাধ্য হলাম। নিয়ম করে প্রতিটি রোগীর নাম অপারেশনের খাতায় নথিভুক্ত করার আগে বড় হাসপাতালে "Regret— No bed vacant " ("দুঃখিত, কোনও বেড খালি নেই") ছাপ মারা কাগজটা দেখাতে হত— কিন্তু তা সত্ত্বেও অপারেশনের ওয়েটিং লিস্ট বেড়ে যেতেই থাকল।

বেলপুকুর হাসপাতালের ওষুধ আসতো তিনমাস বাদে বাদে, আর তা পরিমাণে এতই কম যে একমাসের বেশি চলত না। অপারেশনের যন্ত্রপাতি, সুতো ইত্যাদি তো চাওয়াই যেতো না— প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওইসব জিনিসের ব্যবহার নাকি নিষিদ্ধ। একদিন হঠাৎ আশিস আমাকে বলল-"দাদা, ডা. অনিরুদ্ধ কর বলেছেন ওনার কাছে আপনাকে একবার নিয়ে যেতে"। ডা. কর'কে আমি চিনতাম না, কিন্তু আশিসের কাছে ওনার কথা শুনেছিলাম, জানতাম যে আশিসকে উনি ছোট ভাইয়ের মতন স্নেহ করেন। শুনলাম তিনি তখন সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের

> দশটা খাট, তোষক, অটোক্লেভ, সাকশন মেশিন, যন্ত্রপাতি, গাউন ইত্যাদি— এতোগুলো জিনিস নিয়ে যাব কি করে?

দায়িত্বে আছেন। প্রয়োজনের তুলনায় ওষুধপত্র এতই কম পেতাম যে আমার বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। তা সত্ত্বেও আশিসের অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে একদিন গেলাম নীলরতন সরকার হাসপাতালের পাশে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরে। পরিচয় পর্বটা সেরে নিয়েই উনি আমাকে আর আশিসকে নিয়ে গেলেন অনেকগুলো শেলফওয়ালা একটা বড় ঘরে। প্রতিটি শেলফে নানা রকমের যন্ত্রপাতি সাজানো। বললেন— "যা যা লাগবে নিয়ে এক সঙ্গে রেখে দে"। একটু দিশেহারা হয়েই আমি আর আশিস কয়েক রকমের ফরসেপ্স, কাঁচি ইত্যাদি নামালাম। বড় অপারেশন করার জন্য যন্ত্রপাতিগুলো দেখে লোভ হলেও সেইদিকে হাতই বাড়ালাম না— ভাবলাম দেবেনা নিশ্চয়ই, লোভ করে কি লাভ? ঘন্টাখানেক বাদে ডা. কর ফিরে এসে একটু হেসে বললেন— "কি রে, কিছুই তো বাছিসনি দেখছি!" সঙ্গে একজন কেরানী ছিলেন। অনিরুদ্ধ'দার ফর্দ অনুযায়ী সবকিছু যখন একসাথে করা হল, দেখে আমার আনন্দ বেশি হল নাকি চিন্তা বেশি হল বলা মুশকিল— দশটা খাট, তোষক, অটোক্লেভ, সাকশন মেশিন, যন্ত্রপাতি, গাউন ইত্যাদি— এতোগুলো জিনিস নিয়ে যাব কি করে? লরি ভাড়া করার মতন টাকাও তো আনিনি!! অনিরুদ্ধদা আর একজনকে ডেকে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরেরই একটা লরিতে সব জিনিসগুলো তুলতে বললেন। এই টাকাটাও বেঁচে গেল। বেলপুকুরে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। এই অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে রওনা দেবার সময়ে অনিরুদ্ধদাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সরকারি চাকরিতে ঢুকে কয়েক দিনের মধ্যেই ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। এই ঘটনাটা আমার কাছে প্রমাণ করে দিল যে সরকারি চাকরিতেও কিছু মানুষ আছেন যাঁরা অন্যদের সাহায্য করার জন্য লাল ফিতের বাঁধন মানেন না, উৎসাহ দেন। আমি ভাগ্যবান যে এই রকম বেশ কিছু লোকের সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম।

লেখক পরিচিতি: ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত এম বি বি এস। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশনে (WHO) জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন।

একক মাত্রা advt.

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)

আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭

দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

● স্বাস্থ্যের বৃত্তে: চিকিৎসার মানবিক মুখের সন্ধানে চেনা স্বপ্ন, অচেনা পথ

ডাক্তারের ডেস্ক

প্রশ্ন ১ ঃ আপনাদের বিগত সংখ্যায় একটি লেখায় সার্জিক্যাল জন্ডিসে 'Liv 52' বা ওই জাতীয় ওষুধের কোনো উপযোগিতা নেই লেখা হয়েছিল। আমি ২০০৭ সালে জন্ডিসে আক্রান্ত হই ও ডাক্তারবাবুর পরামর্শে দীর্ঘদিন ঐ ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধ খাই ও বর্তমানে আমি সুস্থ। আমি আরও অনেককে ঐ ওষুধ ও অন্যান্য লিভার টনিক নিয়মিত ব্যবহার করতে দেখেছি। আমার প্রশ্ন ঐ জাতীয় ওষুধগুলি কি কেবলমাত্র মেডিকেল জন্ডিসে ব্যবহারের জন্যই নাকি ঐ জাতীয় বিভিন্ন লিভার টনিকের কোনো উপযোগিতা নেই? যদি বিস্তারিত ভাবে আপনারা আপনাদের পরবর্তী সংখ্যায় এ ব্যাপারে লেখেন তাহলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ এবং রোগীদের খুব উপকার হয়।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র প্রামাণিক, মন্তেশ্বর, বর্ধমান।

উত্তর ঃ প্রথমত ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি প্রশ্নের জন্য। কারণ আমার মনে হয় এটি শুধুমাত্র আপনার একার জিজ্ঞাসা নয়, আপনার মতো আরও অনেকের এই ব্যাপারে সুষ্ঠু ধারণা নেই। আপনি একটি নির্দিষ্ট ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার একটি নির্দিষ্ট ওষুধের নাম করেছেন। বর্তমানে যে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি বহুলভাবে প্রচলিত যাকে 'মডার্ন মেডিসিন' বলা হয় বা 'অ্যালোপ্যাথি' বলি সাধারণভাবে, তাতে ঐ জাতীয় ওষুধ অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যাপারটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা দরকার।

প্রথমত, ঐ জাতীয় লিভার টনিক হল আর্য়ুবেদিক ওষুধ। আয়ুর্বেদিক ডাক্তারবাবুরা ছাড়া অন্য কোনো ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে আয়ুর্বেদিক বিভিন্ন ওষুধ ও তাতে ব্যবহৃত গাছ-গাছালির গুণাগুণ ও উপযোগিতা পড়ানো হয় না। তাই এই সমস্ত ওষুধে থাকা বিভিন্ন যৌগ ও তাদের ব্যবহার ও ক্ষতিকারক দিকগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত না থাকার কারণে অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন হোমিওপ্যাথি বা মডার্ন মেডিসিনের প্র্যাকটিসনাররা এগুলি রোগীর রোগ সারানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন না। ব্যাপারটা অনেকটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবুর অ্যালোপ্যাথির ওষুধ লেখার মতো। ভালো কথায় একে বলা হয় Cross Practice যা আইনত নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়ত, বাজারে চলতে থাকা বিভিন্ন লিভার টনিকের অনেকগুলোই ওষুধ তৈরির বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে আসে না। বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরির ক্ষেত্রে কোনো একটি 'যৌগ' যা পরবর্তী ক্ষেত্রে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে তাকে কমপক্ষে চারটি ধাপে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেওয়া হয়। এই সমস্ত ধাপগুলির মাধ্যমে যেমন শরীরে ওষুধ হিসেবে যে যৌগ ব্যবহার করার ছাড়পত্র দেওয়া হবে তার কুপ্রভাব দেখা হয় তেমনি আবার 'ডবল ব্লাইন্ড ট্রায়াল'-এর মাধ্যমে ডাক্তার ও রোগীর অজান্তে পরীক্ষাধীন এই ওষুধ ব্যবহারে রোগের গতিপ্রকৃতি ও রোগ উপশমে তার কার্যকরী ভূমিকা খতিয়ে দেখা হয়। এই দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যেমন কোনো যৌগের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন অঞ্চলের ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত মানুষের মধ্যে কেমন হচ্ছে তা বোঝা যায় তেমনি পরবর্তীকালে তার ব্যবহারের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের ব্যাপারে সচেতন থাকা যায়। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের লিভার টনিক জাতীয় ওষুধগুলির ক্ষেত্রে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুই করা হয়নি।

তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বাজারে প্রচলিত ও বহুল বিক্রিত ওষুধগুলির মধ্যে লিভার টনিক (তা সে যে কোম্পানিরই হোক) অন্যতম। এরকমটা হওয়ার কারণ কি? আমার মনে হয় আমরা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আপনার প্রশ্নের আরও একটি দিকের উত্তর খুঁজে পাব। জন্ডিস রোগীদের অধিকাংশেরই জন্ডিসের কারণ সংক্রমণ, যাকে বলা হয় 'ভাইরাল হেপাটাইটিস'। জলবাহিত (হেপাটাইটিস ভাইরাস A এবং E) ও রক্তবাহিত (হেপাটাইটিস ভাইরাস B এবং C) বিভিন্ন ভাইরাসের সংক্রমণে লিভারে প্রদাহ (inflammation) হয় ও তার ফলশ্রুতিতে জন্ডিস হয়, প্রস্রাব ও নখের সাদা অংশ হলুদ বর্ণ হয়ে যায়। এই জাতীয় জন্ডিস ও আরও কয়েকটি কারণে হয়ে থাকা জন্ডিসকে একত্রে আগে বলা হত 'মেডিকেল জন্ডিস'। এই জাতীয় জন্ডিসের প্রধান কারণ হল জলবাহিত ভাইরাস ঘটিত হেপাটাইটিস। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীকে বিশ্রামে রাখা ও রোগীর উপযোগী খাদ্যগ্রহণ; বমি হওয়া, পেটে ব্যথা ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ (supportive thrapy); পায়খানা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা দেখা ও না হলে তার জন্য ওষুধ দেওয়া, ও লিভারের অবস্থা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করে সেই অনুসারে আরও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদি করা হয়। এর মধ্যে লিভারকে ভালো করে তোলার জন্য লিভার টনিকের কোনো ভূমিকা নেই, কারণ inflammation কমে গেলে লিভার বা যকৃত ক্রমশ নিজের কাজ করতে শুরু করে ও এই প্রক্রিয়াটি হয় নিজে থেকেই। ডাক্তারবাবুর কাজ শুধুমাত্র এই মধ্যবর্তী সময়ে রোগীকে তার জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস ও বিশ্রামের ব্যাপারে অবহিত করানো ও প্রয়োজনে বিভিন্ন ওষুধ (supportive thrapy) দেওয়া। যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্ডিস সংক্রমণ ঘটিত ও তা আপনা থেকেই সেরে যায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সব ক্ষেত্রে নয়) এই লিভার টনিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন তাই এই দুইয়ের সুযোগে বাজারের বিভিন্ন ওষুধের দোকান ও অনেক ডাক্তারবাবুরা এইগুলি রোগীদের দিয়ে থাকেন। ওষুধ কোম্পানিগুলিও এই অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

অতএব ধীরেন্দ্রবাবু, আপনার যেসব পরিচিতেরা এই জাতীয় লিভার টনিক নিয়মিত খান তাঁদেরকে আপনি এখন থেকে এগুলি খাওয়ার আগে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার কথা বলতেই পারেন।

উত্তর দিয়েছেন ডা. অরিজিৎ বাগ, বর্তমানে জেনারেল মেডিসিন-এ এম ডি পাঠরত।

দুই প্রতিজ্ঞার গপ্পো— সকলের জন্য স্বাস্থ্য ও পোলিও

১৯৮১ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’ এই লক্ষ্য ঘোষণার পর যেন চলছে পিছু হটার পালা। ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’-এর প্রতিশ্রুতিকে ভাসিয়ে দিয়ে ‘টিকাকরণের প্রসারিত কর্মসূচি’-র আপাত সাফল্যকে দেখিয়ে ‘বেছে বেছে (সিলেকটিভ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা’-র কথা তোলা হল, আর বাচ্চার বৃদ্ধির তদারকি, ডায়রিয়ায় ORS, মাতৃদুগ্ধ পান আর টিকাকরণ— এই চারটে জিনিসের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাতেও কি উদ্দিষ্ট ফল লাভ করা গেছে? ১৯৭০ দশকে গুটিবসন্ত নির্মূল করার পর পোলিও নির্মূল করতে একটি প্রজন্ম কেটে গেল। অথচ ইতিহাসে এর চাইতে অনেক দ্রুতলয়ে রোগ নির্মূল করার ঘটনা আছে, আর তার জন্য সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করতে হয়েছে— কোনো ‘শর্টকার্ট’ আসলে পিছিয়েই দেয়— লিখছেন **ডা. প্রবীর চ্যাটার্জি**।

গত শতকের সাতের দশকে গুটিবসন্ত নির্মূল হয়— আমি তখন স্কুলের ছাত্র। সেসময়ের আর পাঁচজনের মতো আমার হাতেও গুটিবসন্তের টিকার দাগ আছে। আজকে আমরা যে গল্পটা করবো সেটার শুরু তার বছর দশেক পর থেকে। ১৯৮১ সালে কাজাকস্তানে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’ এই লক্ষ্য ঘোষণা করল। আর আশির দশকের শেষে এসে, আমরা যখন মেডিকেল কলেজের ইন্টার্ন বা জুনিয়ার ডাক্তার, তখন স্পষ্ট যে ‘সকলের জন্য স্বাস্থ্য’-এর স্বপ্নকে আপ্তবাক্য, অর্ধসত্য আর আমলাতান্ত্রিকতার বেনোজলে ভাসিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

তারপর ১৯৮৮ সালে ১৩ মে। ৪১তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন-এর মঞ্চ থেকে ঘোষণা হল— ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে পোলিও নির্মূল করা হবে। ‘টিকাকরণের প্রসারিত কর্মসূচি’ (Expanded Programme on Immunization বা EPI) দিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও একবছরের নিচে শিশুদের অর্ধেকেরও বেশিকে ডিপথেরিয়া-টিটেনাস-হুপিং কাশির টিকাকরণ ও পোলিওর টিকার তিনটে ডোজ দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, আর হাম-টিটেনাস-হুপিং কাশির প্রকোপে শিশুমৃত্যুর হাত থেকে বছরে দশ লাখের বেশি শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল; এইসব দেশে বছরে কুড়ি হাজার শিশু পোলিওতে পঙ্গু হবার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। এই দ্রুত উন্নতি দেখে মনে করা হয়েছিল টিকাকরণ এই হারেই বাড়তে থাকবে, আর উচ্চহারে টিকাকরণ চালিয়ে যাওয়া যাবে, ফলে ১৯৭৭ সালে ৩০তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল (সিদ্ধান্ত নং WHA30.53) ‘১৯৯০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব শিশুর জন্য টিকাকরণ ব্যবস্থা’— সেটা সম্ভব হবে।

আজ ২০১২ সাল শেষ। আজ থেকে দশ বছর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সূত্রে প্রকাশ হয়েছিল— ‘‘ভারতে গণ-টিকাকরণ কর্মসূচি ও রুটিন টিকাকরণে ‘ভ্যাকসিন-জনিত পোলিও-প্যারালিসিস’ (Vaccine-Associated Paralytic Poliomyelitis বা VAPP) হবার সামগ্রিক সম্ভাবনা ল্যাটিন আমেরিকা (প্রতি ১৫ থেকে ২২ লক্ষ টিকাকরণ পিছু ১টি), ইংল্যান্ড ও ওয়েলস (প্রতি ১৪ লক্ষ টিকাকরণ পিছু ১টি), এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (প্রতি ২৫ থেকে ৩২ লক্ষ টিকাকরণ পিছু ১টি)— এদের চাইতে কম বলে আন্দাজ করা হয়েছে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস (বা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিন কেবলমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবার সাধারণ অংশ হিসেবেই দেওয়া হয়েছিল। ল্যাটিন আমেরিকায় কিন্তু রুটিন টিকাকরণের সাথে সাথে গণ-টিকাকরণ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছিল। ভারতের ক্ষেত্রে গণ-টিকাকরণ কর্মসূচির মাপটা ছিল আগের যেকোনো গণ-টিকাকরণ কর্মসূচির চাইতে অনেক অনেক বড়। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রত্যেক বছর প্রতি ‘জাতীয় টিকাকরণ দিবস’-এ অন্তত সাড়ে বারো লক্ষ বাচ্চাকে মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। সুতরাং মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিন গ্রহণ করার ব্যাপারটা অনেক তীব্র।’’...

''সুতরাং ২০০২ সালের শেষে পোলিও মুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্য পূরণ করতে এবং তারপর **মুখে খাবার পোলিও ভ্যাকসিন দেওয়া বন্ধ করতে** প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো শিশুর সাধারণ পোলিও ভাইরাস বা ভ্যাকসিনের পোলিও ভাইরাস দ্বারা পোলিওজনিত পক্ষাঘাত, পঙ্গুত্ব বা মৃত্যু না ঘটে।'' এই কথাগুলি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপত্রে ২০০২ সালে প্রকাশ পায় (Kathryn A et al. Vaccine-associated paralytic poliomyelitis in India during 1999: decreased risk despite massive use of oral polio vaccine. Bulletin of the World Health Organization Vol. 80 No 3, Geneva 2002)।

আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে ডা. যশ পাল নিম্নোক্ত মেমোরান্ডামটি দিয়েছেন, এবং তাতে 'পালস পোলিও' দ্বারা গণ-টিকাকরণ কর্মসূচির সুদৃঢ় প্রবক্তারা কিঞ্চিৎ আপসেট। মেমোরান্ডামটি প্রকৃত চিত্র খানিকটা তুলে ধরে—

''...হিন্দুস্থান টাইমস-এর ১৪ আগস্ট ২০০৭ সংখ্যার ৯ পৃষ্ঠার একটি খবরের হেডিং হল 'পোলিও ভ্যাকসিন নিতে অস্বীকার করলে বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ আর রেশন কার্ড হারাতে হয়'। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর থেকে সাংবাদিক লিখছেন, 'মনে হচ্ছে উত্তরপ্রদেশে এই প্রথম পোলিও (ভ্যাকসিন) অভিযান মানুষকে সরাসরি জানিয়ে দিচ্ছে— পোলিওর ফোঁটা না খাওয়ানোর জন্য তাঁদের অনেক মূল্য দিতে হবে। বাচ্চাকে পোলিওর টিকা খাওয়াননি— এই জন্য এই জেলার অন্তত দুজন মানুষের রেশন কার্ড ক্যানসেল করা হয়েছে আর তাঁদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে।... সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের এই কাজটি অযৌক্তিক ও বেআইনি, কেননা—

১। মুখে খাবার পোলিও টিকাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়নি। যদি কোনো টিকাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েও থাকে তবু বাচ্চার মা-বাবার বাচ্চাকে তা না দেবার অধিকার থাকে। সেক্ষেত্রে তাঁদের টিকা প্রত্যাখ্যানের কারণ দেখানো ও নিজ দায়িত্বে প্রত্যাখ্যান করা দরকার।

২। টিকা দেওয়া হয়নি এমন বাচ্চার পোলিও না হতে পারে। 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ভ্যাকসিন'-এর জার্নাল 'ভ্যাকসিন', আগস্ট ২০০৭ সংখ্যা, নিবন্ধ 'What needs to be done for polio eradication in India?' দ্রষ্টব্য।

৩। এখন যেসব পোলিও আক্রান্ত শিশু দেখা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশের পোলিও হবার আগে পোলিও টিকার সাত-সাতটি ডোজ দেওয়া হয়ে গেছিল।

৪। টিকা দ্বারা ঠেকানো যায় এমন রোগের মধ্যে যেগুলোর জীবাণু এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যথা পোলিও ভাইরাস, সেসব ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট জনগণের সব্বাইকে টিকা দেবার দরকার হয়না।

৫। টিকা দেওয়া হয়নি এমন একটি বাচ্চা যে রোগ ছড়াবে তাও নয়— 'ভ্যাকসিন' জার্নালের আগে উল্লিখিত নিবন্ধটির ৫.২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৬। যে বাচ্চা অনেকগুলি পোলিও টিকার ডোজ পেয়েছে সেও রোগ ছড়াতে পারে।

৭। সব বিশেষজ্ঞই জানেন যে ১৯৯৯ সালে ভারতে মুখে খাবার পোলিও টিকা দ্বারাই ১৮১টি পোলিও রোগ হয়েছিল।

... কোনো যত্নবান সমাজ বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রই জোর করে মুখে খাবার পোলিও টিকা দেওয়াকে অনুমোদন করতে পারেনা, আর এই টিকা পুরো নিরাপদ নয়, পুরো কার্যকরও নয়— সেটা সারা বিশ্বের সব বিশেষজ্ঞই জানেন।

...'সায়েন্স' জার্নালে একটি নিবন্ধে (২০০৬ সাল, পৃষ্ঠা ১১৫০-১১৫৩) গ্রাসলি ও তাঁর সহকর্মীরা বলেছেন যে উত্তরপ্রদেশে মুখে খাবার পোলিও টিকাতে বাচ্চাদের যথাযথ সাড়া পাবার হার ভারতের অন্য সবজায়গার তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। আমি এছাড়াও 'ভারতীয় শিশুবিশেষজ্ঞ এ্যাকাডেমি'-র 'পোলিও নির্মূলকরণ কমিটি'-র বুলেটিনে (ভ্যলুম ৩, ইস্যু ১, পৃষ্ঠা ১৪-১৬) দেখাতে পারি...

অর্থাৎ মুখে খাবার পোলিও টিকা উত্তরপ্রদেশের বাচ্চাদের যথাযথ সুরক্ষা দিচ্ছে না। এই বৈজ্ঞানিক সত্য মেনে নেবার চাইতে কর্তৃপক্ষ উল্টে এইসব মানুষদের সাজা দিচ্ছেন।

এই মেমোরান্ডামের মাধ্যমে আমি কমিশন থেকে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিকার দাবি করছি ঃ

১। রেশন কার্ড নেওয়া হয়েছে আর বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে যেসব বাড়িতে সেখানে তা ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

২। যাঁদের ভ্রান্ত অতি-উৎসাহের ফলে এইসব পরিবারের অসুবিধা ও কষ্ট হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

... ডা. যশ পাল, জয়পুর। ই-মেল: dryashpaul2003@yahoo.com।

আজ ১৯৮৮ সালে জন্ম নেওয়া বাচ্চারা সব ২৪ বছরের। আর যেসব বাচ্চারা ১৯৯৯ সালে ভারতে মুখে খাবার পোলিও টিকা দ্বারা পোলিও রোগাক্রান্ত হয়েছিল, তাঁদের বয়স এখন ১৩ থেকে ১৮ বছর। আর যেসব বাচ্চাদের মা-বাবারা পালস পোলিও কর্মসূচি চালুর ১৯ বছর পরে, ২০০৭ সালে, টিকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন তাদের এখন বয়স পাঁচ থেকে দশ বছর। ২০১০ সাল থেকে ভারতে কোনো স্বাভাবিক পোলিও ভাইরাস (wild polio virus) পাওয়া যায়নি, সুতরাং ২০১৩ সালের মাঝামাঝি হয়তো ভারতকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করা হবে। পালস পোলিও গণ-টিকাকরণ কর্মসূচি শুরুর দু দশক পরে, এবং একটি 'উপর থেকে নিচে' কর্মসূচির মাধ্যমে বহু খরচ করে আমরা এবার হয়তো 'মুখে খাবার পোলিও টিকা দ্বারা পোলিও রোগ' যা প্রতি বছরই হয়তো ১৮১ জন করে বাচ্চার হচ্ছে, তা ঠেকাতে পারব। পুরো এক দশক দেরি হয়ে গেল!

এই এতবছর ধরে রুটিন টিকাকরণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের মেমারি আর পাহাড়হাটির গ্রামীণ অঞ্চলে সিধু কানু গ্রাম উন্নয়ন সমিতি আর কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ এই দুটো সংগঠনের কাজের ফলে ১৯৮৯ সালেই ৬০টি গ্রামে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি টিকাকরণ সম্ভব হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকের

গোড়ায় তামিলনাড়ুতে পশ্চাৎপদ জেলা আরকটের ভেলাগিরি পাহাড়ি অঞ্চলেও শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি টিকাকরণ করা গেছিল। কিন্তু তার সিকি শতাব্দী পরে আমরা বিহারে হাম-এর অবস্থা খতিয়ে দেখছি মাত্র, এবং আমাদের যথেষ্ট হামের টিকা নেই। ২০১২ সালে মুম্বাইতে তিন মাসের হামের টিকা কম পড়েছিল। ১৯৮০-র দশকে ইউনিসেফ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'-র বদলে 'বেছে বেছে (সিলেকটিভ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা'-র কথা বলেছিল। বাচ্চার বৃদ্ধির তদারকি, ডায়রিয়ায় পুণর্জলীকরণ (ORS), মাতৃদুগ্ধ পান আর টিকাকরণ— এই চারটে জিনিসের (ইংরেজি আদ্যক্ষরগুলি নিয়ে সংক্ষেপে GOBI) ওপর জোর দিয়েছিল। আর অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে? উড়িষ্যা বাকি ভারতের চাইতে ঢের এগিয়ে, আর উড়িষ্যার কোরাপুট জেলা এমনিতে পশ্চাৎপদ হলেও নিয়মিত ওজন করার ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে— সেই উড়িষ্যার মোট বাচ্চাদের মাত্র ৫৬ % কে নিয়মিত ওজন করা অর্থাৎ বৃদ্ধির তদারকির প্রাথমিক ধাপটুকু করা হয়। (সূত্র ঃ http://koraput.nic.in/new/DPMU/ICDS.pdf)।

মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল নামক অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহ-আহ্বায়ক ডা. জি রাখাল বলেন, '' তামিলনাড়ুতে সারা রাজ্য জুড়ে ৯০%-এর বেশি বাচ্চাকে সব টিকা দেওয়া হয়েছে এমন বলা হয়। কিন্তু হামের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি টিকাকরণের সুযোগ সবাই সমান পায়নি; কিছু কিছু জেলায় এমনকি ৭৪.৩% বাচ্চা এই টিকা পেয়েছে।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, যদিও এখনো অবস্থাটা আঁতকে ওঠার মতো নয়, কিন্তু এই রাজ্যের কাজের মান কমে যাচ্ছে। ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি হেলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর প্রধান ডা. কুরিয়েন জর্জ বলেন, ''২০০৮ সালে টিকাকরণের পরে চারজন বাচ্চার মৃত্যু ঘটেছিল। তারপর থেকে সরকার গ্রাম লেভেলে টিকাকরণ কর্মসূচি বন্ধ করে দেন, ও বাচ্চার টিকাকরণের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মানুষকে যেতে বাধ্য করেন।'' (Times News, Jan 22, 2011)। এদিকে ১১টি জেলা জুড়ে ৪০০০ মায়ের উপর করা এক সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, ''পুরো টিকাকরণ হয়েছে এমন বাচ্চার সংখ্যা ৮৭.৩ %, সরকার যেমন দাবি করেছেন সেরকমই।''

এমনকি 'বেছে বেছে (সিলেকটিভ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা' আর বাচ্চার বৃদ্ধির তদারকি, ডায়রিয়ায় পুণর্জলিকরণ (ORS), মাতৃদুগ্ধ পান আর টিকাকরণ— এই চারটে বিষয়কেও কার্যকরী করা যায়নি। এতগুলো বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে আমি 'সিনিয়র' হয়েছি, আমার মেডিকেল সহপাঠীরা মেডিকেল কলেজগুলোতে ম্যানেজমেন্ট চালাচ্ছে, আমাদের স্কুল সহপাঠীদের একজন রাজ্যের স্পিকার, একজন রাজ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ার। গুটিবসন্ত থেকে পোলিও— এটুকু যেতে আমাদের এক প্রজন্ম লেগে গেল। তবু আমরা ভাবছি এই একটা রোগের পর আর একটা রোগ খতম করা— এটাই নাকি 'শর্টকার্ট' পথ। একটা গোটা দেশ টিবি রোগ নির্মূল করে ফেলল (নরওয়ে, সেখানকার সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে) কিম্বা প্রসব-জনিত মাতৃ-মৃত্যু প্রায় জয় করে ফেলল (ব্রিটেনে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হবার সাথে সাথে) অথচ আমাদের দেশের মানুষ খাদ্য, জল, বাসস্থান, শৌচাগার, ন্যূনতম ওষুধ, প্রসবকালীন জরুরি পরিষেবা— এইসব স্বাস্থ্যের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারবে না? 'বেছে বেছে করা' সহস্রাব্দ লক্ষ্যগুলির দিকে দেখুন— ইংরেজি নতুন সহস্রাব্দর শুরুতে সেগুলি বেছে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাজ কিছুই প্রায় এগোয় নি। আমাদের দেশের দ্বাদশ প্ল্যানিং কমিশনের 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা' প্রতিশ্রুতিপত্র এখনো স্বাক্ষরিত হবার প্রতীক্ষায়।

'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' নয় কেন?
এখনই নয় কেন?
'ওয়াল স্ট্রিট দখল কর' স্লোগান যেমন বলছে, তেমনই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে শুনিয়ে বলা দরকার। বলা দরকার ৯৯% লোকের কথাটাই শুনতে হবে।

লেখক পরিচিতি: ডা. প্রবীর চ্যাটার্জি, এম বি বি এস, এম ডি, কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অনুবাদ করেছেন ডা. জয়ন্ত দাস, কলকাতার একটি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক।

কুইজের উত্তর

১। ২৫-৩০ গ্রাম
২। T_3, T_4
৩। আয়োডিন
৪। টি এস এইচ বা থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন
৫। ক্রেটিনিজম
৬। হাইপোথাইরয়েডিজম
৭। থাইরোগ্লোবুলিন
৮। সি কোষ, ক্যালাসিটোনিন
৯। অ্যানাপ্লাস্টিক কারসিনোমা
১০। প্যাপিলারি কারসিনোমা

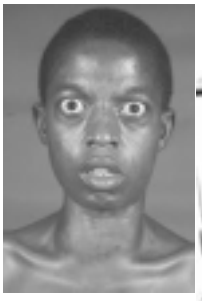

১১। ভাইরাল থাইরয়েডাইটিস
১২। থাইরোটক্সিকোসিস
১৩। গলগন্ড, অতিরিক্ত মাত্রায় থাইরয়েড হরমোন ক্ষরণ, অক্ষিগোলকের সমস্যা
১৪। পারক্লোরেট, থায়োসায়ানেট
১৫। পি এ এস নামক টিবি-র ওষুধ, ফিনাইল বিউটাজোন, লিথিয়াম, আয়োডাইড যৌগ
১৬। এক্সোপথ্যালমস।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস— কী ও কেন?

‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ (Evidence Based Medicine বা EBM) নিয়ে এদেশের অনেক ডাক্তারেরাও এখনও কিঞ্চিত ধন্ধে আছেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা তো মনগড়া কিছু ব্যাপার নয়, তা ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ’এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত। হঠাৎ করে বিংশ শতকের একদম শেষের দিকে যখন ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ তথা EBM নামটি জার্নালে সেমিনারে আসতে থাকল, অনেকেই ভাবলেন— এ আবার নতুন কি? তারপরে যখন ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস’ (Evidence Based Practice or EBP) এল তখনও আমাদের অনেকেরই মনে হল, এও বোধহয় নতুন বোতলে পুরোনো মদ। যে বিষয়টি আমাদের অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেল তা হল, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণকে বহুদিন যাবত খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকলেও, বিভিন্ন ধরণের সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে কোনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনটার ওপর কতখানি ভরসা করা যায়— এই ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার ছিল না। এমনকি কোনো ডাক্তার যদি মনে করতেন, তাঁর রোগীকে সবচেয়ে প্রমাণিত চিকিৎসা প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন, তাঁর পক্ষে সেই চিকিৎসা প্রণালী খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে অনেক অকেজো চিকিৎসা চালু হয়ে উঠেছিল— রোগীদের জন্য তার ফল যে ভালো হয়নি সে কথা বলাই বাহুল্য। অনেক বড় হাসপাতাল আর গবেষণাগারের দিকপাল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাত ধরে আধুনিক ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে আবার কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকরাই আজ থেকে বছর কুড়ি আগে প্রথম ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, আর সেটার সংজ্ঞা দেন। সেই ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির ডাক্তার তাপস মন্ডল ও ছাত্র চেতন গোহাল **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পাঠকদের জন্য কলম ধরেছেন। এবারে তাঁদের লেখার তৃতীয় পর্ব।

[প্রাক-কথন ঃ **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র বিগত দুটি সংখ্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-নভেম্বর২০১২) আমরা লিখেছি যে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ঠিক করতে চিকিৎসক-গবেষকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র সেই গোষ্ঠির বিজ্ঞান যাদের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তিকর (Deterministic) না হয়ে কেবলমাত্র সম্ভাবনাসূচক (Probablistic), অর্থাৎ একই চিকিৎসা সকলের ক্ষেত্রে সমান ফল দেয় না। সুতরাং গবেষকরা অনেক রোগীর উপর একটি ওষুধ প্রয়োগ করে দেখেন তা বিনা-ওষুধে থাকার চাইতে বা পুরানো অন্য ওষুধের তুলনায় ভালো কিনা। অনেক রোগী এমনি-এমনি বা চিকিৎসার প্ল্যাসিবো এফেক্ট তথা ‘রোগীতোষ ক্রিয়া’-র ফলে ভালো হয়ে যায়, তাই কয়েকটি পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতিতে ওষুধ ইত্যাদির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে হয়। Randomized Controlled Trial (RCT-‘আর সি টি’), এরকম এক পদ্ধতি। সবক্ষেত্রে এইটিই যে প্রযোজ্য হবে তা নয়, কিন্তু সর্বত্রই কোনো না কোনো উপযুক্ত পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পরীক্ষা করা সম্ভব।

সত্যিকারের ভালো চিকিৎসা, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা গড়ে উঠেছে সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। যে চিকিৎসা কাজে লাগে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাকে বিদায় করা হয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস হল **সঠিক, সর্বশেষ ও যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের সুবিবেচক প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া**। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের তিনটি অংশ— (চিকিৎসকের) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, যে রোগীকে তিনি দেখছেন তার বাইরে নথিভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এবং রোগীর নিজের মূল্যবোধ ও চাহিদা। অনেকে ভুল করে ভাবেন যে সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বদলে কেবল পুঁথি ঘেঁটে দেখে— কিন্তু আসলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবে অভিজ্ঞতাকে পুঁথি-জার্নালে প্রকাশিত সাক্ষ্য-প্রমাণের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল রোগীর মূল্যবোধ ও চাহিদা। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস-এ বিধিবদ্ধ নথির বিশ্লেষণ করে চিকিৎসক রোগীকে সম্ভাব্য উপকার ও ঝুঁকির কথা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ‘শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য’— বিভিন্ন চিকিৎসার প্রণালী ও তাদের সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কে তথ্য একসাথে এনে তাদের বিশ্লেষণ করা, গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা অনুসারে তথ্য সাজানো, এবং তার সাহায্যে চিকিৎসককে ঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যোগানো। কমপিউটারে ইন্টারনেটের সাহায্যে ও বহু যত্নপ্রসূত পরিকল্পনার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে।]

স্কটিশ মিলিটারি ডাক্তার আলেক্সান্ডার হ্যামিলটনের নাম বোধ করি পাঠকদের কারও জানা নেই। জানার কথাও নয়। ১৮০৯ সালে, অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন চিকিৎসকদের হাতে অতিরিক্ত রক্তমোক্ষণের ফলে মারা যাবার বছর-দশেক পরে ডাক্তার আলেক্সান্ডার হ্যামিলটন খুব অদ্ভুত একটা কাজ করেছিলেন, অন্তত সে যুগের বিচারে। তখন তিনি পোর্তুগালে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ডাক্তার। ডাক্তারি স্কুলে তিনি শিখে এসেছেন— প্রায় সব অসুখেই মহৌষধ হল রক্তমোক্ষণ। শরীর থেকে বদরক্ত বের করে দিলেই শরীর সেরে যাবে। কোনো অজ্ঞাত কারণে ডা. হ্যামিলটন ঠিক করলেন, ব্যাপারটা নির্বিবাদে মেনে নেবার চাইতে খতিয়ে দেখলে ভালো হয়। তখন যেহেতু সব রোগেই রক্তমোক্ষণ করা হত, তাই তাঁর মনে হল একটা অসুখে রক্তমোক্ষণের কার্যকারিতা বিচার করে লাভ নেই, যতরকমের অসুখে রক্তমোক্ষণ-চিকিৎসা করা হয় তাদের সবগুলো নিয়ে দেখা যাক। সুতরাং তাঁর পরীক্ষা শুরু হল, এবং পরীক্ষা শেষে দেখা গেল ৩৬৬ জন সৈন্যের উপর রক্তমোক্ষণ করে বা না করে ফলাফল বিচার করা হয়েছে। সে যুগের বিচারে সেটা সত্যিই অদ্ভুত এক পরীক্ষা। পাঠকদের মনে আছে বোধহয় Randomized Controlled Trial বা আর সি টি পদ্ধতি হল আজকের দিনে পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতি, যা দিয়ে কোনো ওষুধ বা চিকিৎসায়

ফললাভ হচ্ছে কিনা সেটা বোঝা যায়। হ্যামিলটনের আমলে আর সি টি কেন, কোনো রকমের পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতি চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রয়োগের ব্যাপারটা প্রায় অকল্পনীয় ছিল। সেই সময়ে হ্যামিলটন তাঁর ৩৬৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করলেন এইভাবে— পরপর তিনজন রোগী যেত পরপর তিনজন ডাক্তারের কাছে। কার কাছে কোন রোগী যাবে সেটা ঠিক হত সে লাইনে কত নম্বরে দাঁড়িয়েছে তার উপর নির্ভর করে। বোঝাই যাচ্ছে লাইনে দাঁড়ানোটা একটা পূর্বনির্ধারিত ব্যাপার নয়, বা অন্য ভাষায়, কোন রোগী লাইনে কত নম্বরে সেটা একটা সেটা একটা নিয়মবিহীন বা র‍্যান্ডম ব্যাপার, ফলত কোন ডাক্তারের কাছে কে যাবে সেটাও একটা র‍্যান্ডম ব্যাপার। তিনজন ডাক্তার সবাই অন্যসব ব্যাপারে রোগীদের একই কায়দায় চিকিৎসা করলেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া যত্ন-আত্তির ব্যবস্থাও হল একইভাবে। খালি দুজন ডাক্তার রক্তমোক্ষণ করলেন না, একজন ডাক্তার সে কাজটি করলেন। যে দুজন রক্তমোক্ষণ করলেন না তাঁদের দুজনের হাতে মারা গেলেন দুজন ও চারজন— মোট ছ'জন রোগী। আর যে ডাক্তার অন্যসব চিকিৎসার সাথে রক্তমোক্ষণও করলেন তাঁর হাতে মারা গেলেন ৩৫ জন রোগী! যেহেতু প্রত্যেক ডাক্তার সমানসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসা করেছিলেন, তাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হল— রক্তমোক্ষণ জীবন বাঁচায় না, তা রোগীকে মারার চিকিৎসা।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র আগের সংখ্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২) আমরা দেখেছি ১৭৯৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রক্তমোক্ষণের ফলে মারা যান। আর ওই ১৭৯৯ সালেই ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ার আদালত রায় দিল, রক্তমোক্ষণ চিকিৎসাশাস্ত্র-সম্মত। সত্যিকথা বলতে কি, এ ব্যাপারে সঠিক জবাব দেওয়া কোনও আদালতের ক্ষমতার বাইরে। চিকিৎসাশাস্ত্রকেই এই জবাব তৈরি করতে হত, আর ডা. হ্যামিলটন তাই করেছিলেন। কিন্তু হ্যামিলটন তাঁর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন নি, এই সেদিন ১৯৮৭ সালে এডিনবরা রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ান-এ রক্ষিত একটি তোরঙ্গে তাঁর গবেষণার বিবরণ পাওয়া গেছে। কাজেই সে গবেষণা যতই নিখুঁত হোক না কেন তা কোনো কাজে লাগে নি। আর এইটা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস-এর একটা মৌলিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়— সঠিক, সর্বশেষ ও যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের সুবিবেচক প্রয়োগ করতে গেলে সেই প্রমাণটিকে অবশ্যই প্রকাশিত হতে হবে। নিখুঁতভাবে তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা তাই সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস-এর জন্য এত জরুরি। ডা. আলেক্সান্ডার হ্যামিলটনের নাম তাই অজানা রয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে (বা বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সংশয়ী চরিত্রের গুণে) প্রশ্নটা অন্যত্রও উঠতে শুরু করেছিল। ডাক্তারেরা কি রোগীকে বাঁচাচ্ছেন, নাকি

তাঁদের মৃত্যু ডেকে আনছেন? বিখ্যাত ফরাসি ডাক্তার পিয়ের লুই এবং অন্যান্যরা রক্তমোক্ষণের ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা করেন, তাঁদের অনেকগুলি প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছিল। তাই হ্যামিলটনের মতো প্রায় নিখুঁত 'আর সি টি' না হলেও সেগুলির সম্মিলিত ফল ডাক্তারদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল রক্তমোক্ষণের ফলে রোগীর ক্ষতিই হয়।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস-এর পদ্ধতি ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও তার উত্তর খুঁজে পাবার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছে, ফলে অর্জিত জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে। এই পদ্ধতিটি পাঁচটি ধাপের সমন্বয়ে গঠিত ঃ প্রশ্ন, উত্তর, বিচার, কর্ম এবং মূল্যায়ন (Holly, 2011)। প্রথম ধাপ হল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বা যেটুকু আমাদের জানা আছে তার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রশ্ন তৈরি করা। প্রশ্ন তৈরি করার জন্য কোন মনুষ্যগোষ্ঠির চিকিৎসা নিয়ে ভাবা হচ্ছে, কি করা হবে, একটা তুলনীয় দল, আর কোন ফল আমরা বিচার করব— এইসব হল মূল বিষয়। যেমন সেদিন, যখন রক্তমোক্ষণ করা হবে কি হবে না তা নিয়ে ডা. পিয়ের লুই এবং অন্যান্যদের গবেষণা প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন কোনো চিকিৎসকের কাছে রোগী এলে তাঁর জানা থাকত রোগীর কোন রোগ হয়েছে, এবং রক্তমোক্ষণ দিয়ে সেই রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। আর প্রশ্ন ছিল তাতে রোগীর কতটা উপকার হচ্ছে। এখানে তুলনীয় দল ছিল দুটি— দুদল রোগী, যাঁরা ওই রোগে ভুগছেন, এবং যাঁরা রোগের তীব্রতার দিক থেকে ও (রক্তমোক্ষণ বাদে) অন্যান্য চিকিৎসার দিক থেকে সমান। বিচার করার জন্য ছিল প্রশ্ন— এই দুদলের মধ্যে রোগ নিরাময়ের হার বা মৃত্যুহারে কি কোনো পার্থক্য আছে?

এর পরের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য উন্নত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 'শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য' পাওয়া দরকার। গবেষককে বিচার করে দেখতে হবে যে, 'শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য' নেওয়া হচ্ছে সেটা কতটা এই বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও কার্যকর; এভাবে অনির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যকে গবেষণা থেকে বাদ দিতে হবে। ডা. হ্যামিলটনের গবেষণার মান গুণগত বিচারে অন্যদের গবেষণার চাইতে ভালো হলেও তা প্রকাশিত হয় নি বলে সেই চিকিৎসকের কাছে তা যে 'বাইরের সাক্ষ্য' হয়ে উঠতে পারেনি। ডা. পিয়ের লুই এবং অন্যান্যদের গবেষণা হল উপযুক্ত 'বাইরের সাক্ষ্য', যা থেকে উত্তর পাওয়া গিয়েছিল — রক্তমোক্ষণ রোগীর সঠিক চিকিৎসা নয়।

গবেষণা চালিয়ে গেলেই যে তা যে মনুষ্যগোষ্ঠির জন্য করা হচ্ছে তাঁদের জন্য কাজের হবে তা কিন্তু নয়। তাই পরের ধাপ হল— গবেষণালব্ধ উত্তরটি অনুযায়ী কাজ করা, আর তার কী ফল হল তা বিচার করা। কাজ করা বা 'কর্ম'-এর ধাপটি প্রয়োগের নতুন নিয়মাবলী তৈরি করার মাধ্যমে চিকিৎসায় জ্ঞানের

ফাঁক-ফোঁকরগুলি ভরাট করতে সাহায্য করবে, আর সেখানেই ক্ষতিকর চিকিৎসা-প্রণালী বাদ পড়ে যাবে, জানা যাবে কোন ক্ষেত্রে আরও গবেষণা দরকার। অর্থাৎ এই ধাপেই চিকিৎসককে বিচার করতে হত— তাঁর কাছে যে রোগী এসেছে তা কি রোগের বিচারে এবং রোগীর অবস্থা বিচারে পিয়ের লুই এবং অন্যান্যদের গবেষণার রোগীদের তুলনায় মোটের ওপর একরকম? তা যদি হয় তিনি তাঁর কৃত্য কর্ম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন— তাঁর রোগীকে রক্তমোক্ষণ করাবেন না। (একেবারে অন্যরকম রোগীর ক্ষেত্রেও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তের মূলে আছে এই তাত্ত্বিক ধারণা— 'রক্তমোক্ষণ রোগ সারাবে এমন ভাবনার পিছনে শারীরবৃত্তীয় যুক্তি নেই')। এবার মূল্যায়ন। রক্তমোক্ষণ না-করা রোগ সারাতে সাহায্য করে— একথার মানে এই নয় যে কেবল রক্তমোক্ষণ বন্ধ করলেই প্রতিটি রোগী সেরে উঠবে। ঠিক তেমনই, পেনিসিলিন নিউমোনিয়া রোগে কার্যকর— এর মানে এই নয় যে পেনিসিলিন ওষুধটি নিউমোনিয়াতে ব্যবহার করলেই প্রতিটি নিউমোনিয়া রোগী সেরে উঠবে। এখানেই মূল্যায়নের তাৎপর্য। ওষুধ বা চিকিৎসা প্রণালী কাজ করছে তো? না করলে, কতজনের ক্ষেত্রে কাজ করছে না? তার সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে (যেমন পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া পেনিসিলিন প্রতিরোধী হয়ে যাওয়া)? 'কর্ম'-এর ধাপটি পরবর্তী 'মূল্যায়ন' ধাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এভাবেই চিকিৎসায় জ্ঞানের ফাঁক-ফোঁকরগুলি ভরাট করতে সাহায্য করে ও জানা যায় কোন ক্ষেত্রে আরও গবেষণা দরকার।

ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যে সত্যিই গভীর গবেষণালব্ধ ফলই কাজে লাগানো হচ্ছে সেটা সুনিশ্চিত করতে চিকিৎসকেরা অবশ্যই ক্লিনিক্যাল কাজের মূল্যায়ন ও বিচার চালিয়ে যাবেন, দেখবেন সত্যিই নতুন নিয়মাবলী অনুসৃত হচ্ছে কিনা। চিকিৎসকেরা যাতে সর্বদা জ্ঞানভিত্তিক অধুনাতম সঠিক গবেষণাসম্মত সিদ্ধান্ত নেন সেটা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস এভাবেই বাস্তবায়িত করে।

এ ব্যাপারটা একটা সহজ রেখাচিত্র দিয়ে ভালোভাবে বোঝানো যায়— এই রেখাচিত্রকে আমরা 'সাক্ষ্যের পিরামিড' বলতে পারি।

- এই মডেলে আমাদের পিরামিডের শীর্ষে 'কোক্রেন-এর সিস্টেমেটিক রিভিউ/ তথ্যভান্ডার' আছে, সেখান থেকে সিস্টেমেটিক রিভিউ-এর খোঁজ শুরু করতে হবে। কোক্রেন-এর তথ্যভান্ডার বর্তমানে ছোটো, সুতরাং সেখানে খোঁজা সহজ; অন্যদিকে এই তথ্যভান্ডার নির্ভরযোগ্যতার বিচারে বড়, এবং একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার মতো তথ্য এখানে পাবার সম্ভাবনাও বেশি।

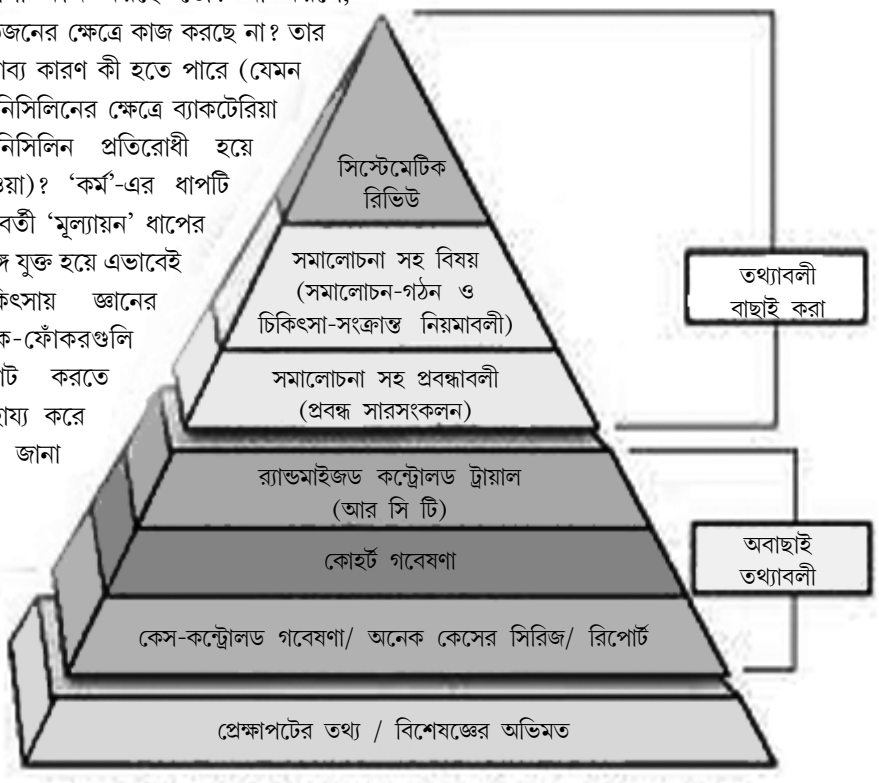

- 'কোক্রেন-এর সিস্টেমেটিক রিভিউ/ তথ্যভান্ডার'-এর জানার বিষয়টি খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়ে তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত পিরামিডের নীচের দিকে নেমে যেতে হবে। যত নীচে যাবো তত বিষয়টির সঙ্গে আমাদের খোঁজের যোগসূত্র কমবে, তার নির্ভরযোগ্যতা কমবে, ফলে আমাদের কাজে সেটা কতটা লাগবে তা বোঝার জন্য আমাদের বেশি খাটতে হবে।

- জার্নালে প্রকাশিত সাধারণ প্রবন্ধ এই পিরামিডের নিচের দিকে বা কম গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেখানে প্রচুর বাছাই না-করা তথ্য থাকে, আর প্রবন্ধ-পাঠককেই ঠিক করতে হয় সেই প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁর বর্তমান সমস্যার যোগসূত্র কতটা, নির্ভরযোগ্যতাই বা কতটা।

র‍্যান্ডমাইসড কন্ট্রোল ট্রায়াল (আর সি টি) সম্পর্কে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি। কিন্তু 'কোক্রেন-এর সিস্টেমেটিক রিভিউ তথ্যভান্ডার' ব্যাপারটা কী, আর সেটা কেনই বা এত গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্ন থেকেই আমরা এখন আলোচনা শুরু করবো।

কোক্রেন কোলাবরেশন ঃ আজকের চিকিৎসকদের অবস্থা দুশো বছর আগেকার অবস্থার ঠিক বিপরীত। আমরা দেখেছি ডা. আলেক্সান্ডার হ্যামিলটন রক্তমোক্ষণ নিয়ে অসাধারণ কন্ট্রোলড ট্রায়াল করে ১৮০৯ সালে প্রায় নিখুঁতভাবে প্রমাণ করে দিলেন রক্তমোক্ষণ-চিকিৎসা শুধু অকেজো নয়, ক্ষতিকর। কিন্তু তাঁর পরীক্ষার ফলাফল তখন প্রকাশ হয়নি, এই সেদিন ১৯৮৭ সালে তাঁর গবেষণার বিবরণ নেহাত ঘটনাচক্রে পাওয়া গেছে। কিন্তু আজকের ডাক্তারদের সামনে প্রতিবছর কয়েক হাজার ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের বিবরণ হাজির হয়। তাতে হাজারো ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পরীক্ষা লিপিবদ্ধ থাকে, কোনোটা হয়তো একদম নতুন ওষুধের প্রয়োগ নিয়ে, কোনোটা পুরানো কোনো ওষুধ নিয়ে, কোনোটা বা নতুন কোনো পরীক্ষার কার্যকারিতা নিয়ে, কোনোটা পুরানো

কোনো পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা নিয়ে। ফলে দেখা যায়, একই অসুখের জন্য একটি ট্রায়ালে যেভাবে চিকিৎসা করা শ্রেষ্ঠ বলছে, অন্য একটি ট্রায়াল অন্য পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করছে। হাজার গবেষণাপত্র পড়ে তাদের মধ্যে কোনটি বেশি নির্ভরযোগ্য সেটা বেছে নেওয়া খুব শক্ত। দিনরাত বই-পত্র-ইন্টারনেটে মুখ গুঁজে গবেষণাপত্র নিয়ে চর্চা করলে হয়তো সেটা সম্ভব, কিন্তু একজন ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে তা অসম্ভব। সুতরাং ডাক্তারদের একাডেমিক গবেষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। এইসব গবেষকদের একাডেমিক যে সংগঠনগুলি আছে তাদের মধ্যে কোক্রেন কোলাবরেশন সবথেকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়। এই বিশ্বজোড়া কোলাবরেশন বা সহযোগিতামূলক সংগঠনের মূল অফিস অক্সফোর্ডে। এর কার্যপদ্ধতি আর ইতিহাস একটু বললে বোঝা যাবে কি করে হাজারো গবেষণার মধ্যে ভালোটিকে বেছে নিতে হয়, আর সেই বেছে নেবার পদ্ধতিটি কিভাবে তিল তিল করে গড়ে উঠল।

স্কটল্যান্ডের লোক আর্চি কোক্রেন লন্ডনে ডাক্তারি পড়ছিলেন। ১৯৩৬ সালে পড়াশুনা স্থগিত রেখে স্পেন দেশের গৃহযুদ্ধে অ্যাম্বুল্যান্স ইউনিটে তিনি যোগ দিলেন। যুদ্ধে তিনি বন্দী হন ১৯৪১ সালে, আর তারপর কয়েকবছর তাঁর কাটে যুদ্ধবন্দী হিসেবে। সেই অবস্থাতেই তিনি সহ-যুদ্ধবন্দীদের ওপর ডাক্তারি করার ভার পান। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ইচ্ছামতো চিকিৎসা করার সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু তখন তাঁর কোন রোগে কী দিতে হবে সেই জ্ঞান ছিল না, এবং তাঁরই জ্ঞানের অভাবে তাঁর সহ-বন্দীরা মারা পড়ছে— সে বেদনা তাঁকে কুরে কুরে খেত। তাই এরপর সারাজীবন তিনি সঠিক চিকিৎসা কী হতে পারে তার চর্চা করেছেন, তাকে বাজিয়ে দেখেছেন।

যুদ্ধশেষে আর্চি কোক্রেন চিকিৎসাবিদ্যার একাডেমিক জগতে যোগ দিলেন। কয়লাখনির শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত বুকের রোগ নিয়ে তাঁর গবেষণা বেশ উঁচুদরের। দ্রুত উত্থান ঘটে তাঁর, ১৯৬০ সালে তিনি টিবি ও বুকের রোগের বিভাগের অধ্যাপক হন। সেই সময় তিনি দেখেন, আগেকার দিনের থেকে অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটছে— আগে ডাক্তাররা একটি বিষয়ে একটিও

ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল খুঁজে পেতেন না, বা পেলে দু-একটি পেতেন। আর এখন বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ফলাফল থেকে অর্থোদ্ধার করতেই তাঁদের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। ১৯৭৯ সালে কোক্রেন লেখেন, ''এটা আমাদের পেশার পক্ষে খুব অগৌরবের বিষয় যে আমরা চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন স্পেশালিটিতে সমস্ত র‍্যান্ডম-কৃত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল (আর সি টি)-এর সমালোচনা-সহ সারমর্ম সংকলনের ব্যবস্থা করিনি, যা কিনা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পুনর্লিখিত হবে।'' কোক্রেনের লেখার মূল কথাটা ছিল 'সমালোচনা-সহ সারমর্ম সংকলন'। এর অর্থ হল, শুধুমাত্র নির্বিচার সারমর্ম লিখলে সেটা কাজে দেবে না, বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মূল্য এক নয়— সেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। ধরা যাক একটি ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে কেউ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করলেন ১৯ জন রোগীকে নিয়ে, আর অন্য কেউ ওটারই ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এ ১০২৩ জন রোগীকে নিলেন। স্বভাবতই গুরুত্বের বিচারে দ্বিতীয় ট্রায়ালটির মূল্য প্রথমটির চাইতে বেশি। কেউ হয়তো কন্ট্রোল গ্রুপ নিলেন, কেউ নিলেন না— যে ট্রায়ালে কন্ট্রোল গ্রুপ নেওয়া হল তার মূল্য বেশি। এইসব ব্যাপার মাথায় রেখে বিভিন্ন স্টাডির সারমর্ম সংকলন করতে হবে। এই পদ্ধতিতে যে সারমর্ম তৈরি হল পরবর্তীকালে তার সাধারণ নাম হল 'সিস্টেমেটিক রিভিউ'— বাংলায় বলতে পারি 'সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমালোচনা'।

'সাক্ষ্যের পিরামিড'-এর শীর্ষে রয়েছে 'কোক্রেনের সিস্টেমিক রিভিউ তথ্যভান্ডার'। তারপরে যেগুলি আছে, তার মধ্যে র‍্যান্ডমাইসড কন্ট্রোলড ট্রায়াল (আর সি টি) নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। সমালোচনা-সহ বিষয় (সাক্ষ্য-প্রমাণ গঠন ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত নিয়মগুচ্ছ— Critically appraised topics Evidence synthesis and guidelines), সমালোচনা-সহ প্রবন্ধাবলী (প্রবন্ধ সারসংকলন) Critically appraised individual articles— Article synopses), ও 'জনগোষ্ঠির ভবিষ্যৎ-অবস্থান নিরীক্ষা' বা কোহর্ট গবেষণা (Cohort studies) — এগুলো সম্পর্কে আমরা বলব **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পরবর্তী সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি: চেতন গোহাল কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির হেলথ সায়েন্স-এর লেভেল ২ ছাত্র। ডা. তাপস মন্ডল ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশুরোগ বিভাগের কার্ডিওলজি ডিভিশনের সহযোগী অধ্যাপক।

অনুবাদ-সহায়তা করেছেন ডা. জয়ন্ত দাস, কলকাতার একটি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক।

প্রয়োজনীয় ওষুধ মানুষের নাগালের বাইরে কেন ও কী করা যায়?

বৈজ্ঞানিক ওষুধ সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ ধারনা, ব্র্যান্ডের প্রতি মোহমুক্তি ও জেনেরিকের প্রতি আস্থাই ব্র্যান্ড-নাম ও অযৌক্তিক ওষুধের নাগপাশ থেকে আমাদের সাময়িক মুক্তি দিতে পারে— লিখছেন **ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য্য**।

অত্যাবশ্যক ওষুধের নাগাল পাওয়া (access to essential medicines) যেকোনো দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের একটি প্রধান নির্ধারক। উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে দারিদ্র বেশি, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাই ওষুধ কেনার অক্ষমতার প্রধান কারণ। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে হিসেব করে দেখা গেছে যে, ভারতীয় জনসংখ্যার ৫০% থেকে ৮০% তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধের নাগাল পায় না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র বিশ্ব মেডিসিন প্রতিবেদন (২০০৪) দেখিয়েছে যে, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ (৬৪৯ মিলিয়ন) অত্যাবশ্যক ওষুধ ব্যবহার করার সুযোগ পায় না। ভারত আজকের বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ওষুধ-উৎপাদক দেশ, এবং ভারত ২০০টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করে। স্পষ্টত স্থানীয় উৎপাদনের অভাব জনগণের ওষুধ-প্রাপ্তির মূল প্রতিবন্ধকতা নয়। সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ের বড় অংশটা যায় ওষুধ কিনতে, আর এই খরচের বৃহদংশই রোগীকে তার পকেট থেকে দিতে হয়। বিশ্ব ব্যাঙ্কের সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি বছর ২.২% ভারতবাসী চিকিৎসাব্যয় সামলাতে গিয়ে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যাচ্ছে। (India— Raising the Sights: Better Health Systems for India's Poor. World Bank, May, 2001)। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না ওষুধের দামই ভারতবাসীর আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার প্রধান অন্তরায়।

ভারতের মানুষ স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচের ৮৪ শতাংশ দেন নিজের পকেট থেকে, আর সরকার খরচ করে মাত্র ১৬ %। সারা বিশ্বের মধ্যে ব্যক্তিগত খরচের এই অনুপাত ভারতেই সবচেয়ে বেশি। উপভোক্তা খরচের ওপর 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষা' (NSS) ৫৫ দেখায় যে গ্রামাঞ্চলে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের ৭৭ % এবং শহরাঞ্চলে ৭০ % কেবলমাত্র ওষুধ কিনতে খরচ হয়। গরীব মানুষ হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কোনো দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্রে দেখালেও ওষুধ কিনতেই হয়। বেশি দরিদ্র মানুষ নিজের স্বাস্থ্যখাতে মোট খরচ করতে পারেন কম, তাঁদের ক্ষেত্রে এই খরচের আরও বেশি অংশ স্রেফ ওষুধ কিনতে লেগে যায়।

ওষুধের নাগাল পাওয়ার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার ভূমিকা

স্পষ্টত, মোট স্বাস্থ্যখাতে খরচের মধ্যে ওষুধজনিত খরচার ভাগ দরিদ্রদের মধ্যে বেশি। গ্রাম এবং শহরাঞ্চল দু'জায়গাতেই ধনীদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত নেমে আসে। দরিদ্রতম ২০ % মানুষের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খরচের প্রায় ৮৫ % ব্যয় হয় ওষুধের জন্য। ধনীতম ২০ % লোকের ক্ষেত্রে ওষুধজনিত ব্যয়ের ভাগ গ্রামাঞ্চলে ৭১.৫৯ % ও শহরে ৬২.৩৬ %। দুঃখের ব্যাপার হল স্বাস্থ্যখাতে খরচের চার-পঞ্চমাংশের বেশি বা প্রায় ৮৫ % ব্যক্তিগত খরচ। NSS-এর ২০০৪-এর morbidity survey-তেও এই একই কথা বলা হয়েছে।

খরচের কতটা সত্যিই প্রয়োজনীয়?

এখানে একটু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা দিয়ে শুরু করি। অনেক রোগীকে জিজ্ঞেস করেছি, ''আপনি উচ্চরক্তচাপ (high blood pressure) কমানোর জন্য কী ওষুধ খান?'' উত্তরে তারা স্ট্যাম্লো,

মাথাপিছু পকেট থেকে মাসিক খরচের ধরন

	চিকিৎসা খাতে খরচ (টাকায়)		ওষুধের জন্য খরচ		ওষুধের জন্য খরচ চিকিৎসা খাতে খরচের কত শতাংশ	
গুণমান	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর	গ্রাম	শহর
প্রথম	৭.৭২	১১.৭১	৬.৬৮	৯.৯১	৮৬.৪৭	৮৪.৬০
দ্বিতীয়	১৩.৭৯	২১.৬৬	১১.৭১	১৭.৪৯	৮৪.৮৯	৮১.৭১
তৃতীয়	১৯.৬১	২৯.৭৩	১৬.৪৬	২২.৭২	৮৩.৯৪	৭৬.৪৪
চতুর্থ	২৯.৯৮	৪৭.০০	২৪.৪৪	৩৪.৩৪	৮১.৫৩	৭৩.০৫
পঞ্চম	৭৭.৪৭	১০৫.৬৭	৫৫.৪৬	৬৫.৯০	৭১.৫৯	৬২.৩৬
মোট	২৯.৫৮	৪৩.২৭	২২.৮৫	৩০.১৪	৭৭.২৪	৬৯.৬৬

অ্যাম্লোকাইন্ড কিম্বা অ্যাম্লোড্যাক বলেন। তাঁরা যে আসলে একই ওষুধ অ্যাম্লোডিপিন (amlodipine) খান তাঁরা জানেন না। জানবেন কি করে, তাঁরা তো আর ডাক্তার না। জানেন ডাক্তারবাবু এবং তিনি বলবেন, এতে অসুবিধা কী আছে? হাজার একটা কোম্পানি আছে, তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড আছে, আমার পছন্দের ব্র্যান্ড থাকতেই পারে। অসুবিধা কিছু থাকতো না যদি এদের দাম একই হত। কিন্তু

অনেক রোগীকে জিজ্ঞেস করেছি, ''আপনি উচ্চরক্তচাপ কমানোর জন্য কী ওষুধ খান?'' উত্তরে তারা স্ট্যাম্লো, অ্যাম্লোকাইন্ড কিম্বা অ্যাম্লোড্যাক বলেন। তাঁরা যে আসলে একই ওষুধ অ্যাম্লোডিপিন খান তাঁরা জানেন না। জানবেন কি করে, তাঁরা তো আর ডাক্তার না।

স্ট্যাম্লো ৫.০ মি. গ্রা.-র দাম যেখানে ৪ টাকা, অ্যাম্লোকাইন্ড ৫.০ মি. গ্রা.-র দাম সেখানে ১ টাকা। আপত্তিটা সেখানেই। হিসেবটা একদিনের, টাকার অঙ্কটা মাস বা বছরের হিসেবে একবার কষে দেখুন। অতএব নিদানটা ডাক্তারের, পকেট ফুটো হচ্ছে সাধারণ মানুষের। একই রোগ সারাতে একই ওষুধ খাচ্ছেন সবাই, কিন্তু ডাক্তারবাবুর নির্দেশে এক এক জনের একেক রকম খরচ হচ্ছে। এখানে অনেকে ওষুধের মানের কথা বলবেন। কিন্তু ওষুধের জগতে যত গুড় তত মিষ্টি নয়। প্রতিটি ওষুধ কোম্পানিকেই নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেই ওষুধের লাইসেন্স বজায় রাখতে হয়। এটা ডাক্তাররাও জানেন, না হলে একজন ডাক্তার একই ওষুধ বিভিন্ন ব্র্যান্ডনামে বিভিন্ন রোগীকে দেন কিভাবে? এটা যেকোনো ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। আর 'ব্যাগ হাতে বাবু' (Medical Sales Representative)-রা তো ডাক্তারবাবুদের দিয়ে তো এটাই করান (নিজস্ব ব্র্যান্ড লিখিয়ে নেওয়া)। গুণমানে নয় আসল তফাৎ দামে। আর ওই দামের কারণেই ভারত আজকের বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ওষুধ-উৎপাদক দেশ এবং ওষুধ রপ্তানি করে ২০০টি দেশে, অথচ ভারতীয় জনসংখ্যার ৫০ % থেকে ৮০ % তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ওষুধের নাগাল পায় না। আমাদের আজকের আলোচনা এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে। আসুন আলোচনার গভীরে ঢোকার আগে আমরা বাজারে চালু ওষুধের পরিচয়টা জেনে নি।

জেনেরিক ওষুধ

যে কোনো ওষুধ আসলে একটি যৌগ। এই রাসায়নিক যৌগটি ডাক্তারি শাস্ত্রসম্মত হওয়া দরকার। যে কোনো ব্র্যান্ডেড ওষুধে এই রাসায়নিক কম্পোজিশনের উল্লেখ থাকে। ব্র্যান্ড হল প্রস্তুতকারী সংস্থার দেওয়া নাম। ওষুধটি যখন তার মূল রাসায়নিক নামে অর্থাৎ অব্যবসায়িক নামে (ইন্টারন্যাশনাল নন-প্রপ্রাইটরি নেম- INN) বাজারে পাওয়া যায় তাকে বলে জেনেরিক ওষুধ। এই নামটি অনেক সময় তার ওষুধ-শাস্ত্রীয় নামও হতে পারে। এই ওষুধটির ঔষধ-গুণ (pharmacological property), অর্থাৎ ডোজ, কার্যকারিতা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নিরাপত্তা— সবই ব্র্যান্ডেড ওষুধটির সাথে সমান। ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগের একটি জেনেরিক ওষুধ হল মেটফরমিন। ওষুধটি বাজারে গ্লাইসিফেজ, বাইগুমেট ইত্যাদি ব্র্যান্ডে পাওয়া যায়। জ্বর কমানোর চালু ওষুধ প্যারাসিটামল (ওষুধ শাস্ত্রীয় নাম) বা এসিটামেনোফেন নামে যখন বিক্রি হয় তখন তা জেনেরিক কিন্তু ক্রোসিন, ক্যালপল ইত্যাদি বিভিন্ন কোম্পানির দেওয়া ব্র্যান্ড নাম। আগেই বলেছি উচ্চরক্তচাপ কমানোর সবচেয়ে প্রচলিত জেনেরিক ওষুধটি হল অ্যাম্লোডিপিন যা বাজারে অ্যাম্লোকাইন্ড, স্ট্যাম্লো ইত্যাদি ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়। আমরা যে ব্র্যান্ডের ওষুধ-ই খাই, অসুখ সারানোর বস্তুটি কিন্তু একই দ্রব্য। ডাক্তারি পরীক্ষা, পড়াশুনা, গবেষণা, ডাক্তারদের পারস্পরিক আলোচনা সবই হয় জেনেরিক নামে। শুধু দোকানে কিনতে গিয়ে দেখবেন ব্র্যান্ডের ছড়াছড়ি। কেন এমন হয়, আর মানুষের চিকিৎসায় এর প্রভাব কি? এদেশে কুড়ি হাজার ওষুধের কোম্পানি, একলাখের উপর ফরমুলেশন (formulation) ওষুধের বাজারে বিক্রি করে অথচ ওষুধ কোটি কোটি মানুষের নাগালের বাইরে (unaffordable), কারণ ওষুধের দাম কায়দা করে সেইসব মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপরে তুলে রাখা হয়েছে। ওষুধের ব্যাপক উৎপাদন দেশের চাহিদা পূরণের কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেনি। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ হল যে, অধিকাংশই উৎপাদিত ফরমুলেশন অপ্রয়োজনীয়, যুক্তিহীন এবং ব্যয়বহুল। এটা ঘটনা যে সক্রিয় ফার্মাসিউটিকাল উপাদানগুলোর (API) সংখ্যা মাত্র ৫৫০। উপাদানগুলোর প্রকৃত সংখ্যা এত কম হওয়া সত্ত্বেও এত বৃহৎ সংখ্যক ফার্মাসিউটিকাল পণ্য আসলে ডাক্তার এবং রোগীর অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসার নামে শোষণ ও মুনাফা করার উপায়। এটা হিসেব করে দেখা গেছে যে ভারতের বাজারের চালু ওষুধের মাত্র ২০ শতাংশেই বর্তমান ৮০ শতাংশের বেশি রোগের চিকিৎসা সম্ভব। বহু গুরুত্বপূর্ণ বহুজাতিক কোম্পানির তৈরি ৭০-৮০ শতাংশ ওষুধের প্রোডাকশন আউটপুট হল কাশির সিরাপ এবং ভিটামিন। কাশির ওষুধ অবৈজ্ঞানিক, রোগীর ক্ষতি করতে পারে, এবং ভিটামিন খাওয়ার জন্য যে পয়সা খরচ করতে হয় সে পয়সা খাদ্যের পিছনে খরচ করে অনেক বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়। এইসব কোম্পানিগুলোর বিক্রিত ওষুধের মাত্র ২০-৩০ শতাংশ জীবনদায়ী।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নাকি উপভোক্তা তথা কনজিউমার হলেন আসল রাজা, তাঁরাই ঠিক করেন কোনটা বাজারে চলবে আর কি দামে চলবে। বাস্তবে কিন্তু তা ঘটে না। ওষুধের বাজার হল মুক্ত বাজারের নামে বিক্রেতার করতলগত বাজার তৈরির এক উদাহরণ। ... একই ওষুধের একই লবণ বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বিক্রি হয়, কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তৈরির খরচের মূল্যের ১০ গুণ দামে। অর্থাৎ ১০০০% লাভ নিশ্চিত!!

মুক্ত বাজারের অতিকথা ও ওষুধ-বাজারের একচেটিয়া ব্যবসা

আমরা অহরহ শুনি যে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে উপভোক্তা তথা কনজিউমার হলেন আসল রাজা, তাঁরাই ঠিক করেন কোনটা বাজারে চলবে আর কি দামে চলবে। বাস্তবে কিন্তু তা ঘটে না। ওষুধের বাজার হল মুক্ত বাজারের নামে বিক্রেতার

প্রস্তুতকারী কোম্পানি	কোম্পানির দেওয়া নাম (ব্র্যান্ড নাম)	লবণের রাসায়নিক নাম (জেনেরিক নাম)	ওষুধ ব্যবসায়ী যে দামে কেনে (স্টকিস্ট মূল্য) ১০টি ট্যাবলেট	বিক্রি করা হয় যে দামে (মুদ্রিত MRP)
Cipla	Alerid	Cetrizine 10 mg	২৮.৮৫ টাকা	৩৭.৭৫ টাকা
Cipla	Cetcip	Cetrizine 10 mg	১৮.৮৮ টাকা	৩৩.৬৫ টাকা
Cipla	Okacet	Cetrizine 10 mg	১.৮৪ টাকা	২৭.৭৫ টাকা

করতলগত বাজার তৈরির এক উদাহরণ। দেখুন কিভাবে সেটা ঘটানো হয়।

একই ওষুধের একই লবণ বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বিক্রি হয়, কিন্তু বিক্রি হচ্ছে তৈরির খরচের মূল্যের ১০ গুণ দামে। অর্থাৎ ১০০০% লাভ নিশ্চিত!! এটা সম্ভব করে তোলার জন্য যে বিশেষ মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করা হয় তা আমরা আগেই দেখেছি— কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বাহিনী। তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে ডাক্তারদের জপান যাতে ডাক্তার তাঁর ব্যবস্থাপত্রে কোম্পানির ব্র্যান্ড লেখেন। তখন রোগী কিন্তু ডাক্তারকে বিশ্বাস করে অসন্দিগ্ধভাবে ঐ নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নামের ওষুধ কেনে, তাছাড়া তাঁর উপায়ই বা কি? অথচ কমদামি বিকল্প ব্র্যান্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। এই ভাবে ব্র্যান্ডের নামের সাহায্যে ওষুধ বাজারে একটি কৃত্রিম মনোপলি তৈরি হয়, যা একই পণ্যকে কৃত্রিম উপায়ে 'আলাদা পণ্য'-তে পরিণত করে তাদের মধ্যে মূল্য প্রতিযোগিতায় বাধা দেয়, এবং এর ফলে প্রতিটি ব্র্যান্ডই উচ্চমূল্যে বিক্রি হবার সুযোগ পায়।

বাড়িয়ে বলছি? ঠিক আছে, উদাহরণটা শুনুন, অবিশ্বাস হলে কোনো বড় ওষুধের দোকানে গিয়ে যাচাই করে নিন। যদি কোনো ডাক্তারকে রক্ত-ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে কোনো ব্র্যান্ড নামে Imatinib ওষুধের লবণ লিখতে হয়, তখন হয়তো তিনি ব্র্যান্ড Glivec লেখেন। Glivec-এর এক মাসের কোর্সের খরচ মোটামুটি ১,১৪,৪০০ টাকা। রোগীকে দেওয়া একই অ্যান্টিক্যানসার ড্রাগ, কিন্তু ভিন্ন ব্র্যান্ড নাম Veenat-এ খরচ মাসে ১১,৪০০ টাকা। Cipla কোম্পানি ওই ওষুধই সরবরাহ করে মাত্র মাসিক ৪০০০ টাকায়, এবং Glenmark প্রতি মাসে সরবরাহ করে ৫,৭২০ টাকাতে! একই ওষুধ একলাখ চোদ্দ হাজার টাকা দামে পাবেন, আবার পাবেন চার হাজার টাকা দামেও! এইসব ব্র্যান্ডে থাকে একই ওষুধের (imatinib) একই লবণ (imatinib mesylate) একই পরিমাণে, একই গুণমানে এবং প্রত্যেকটি সমানভাবে কার্যকরী।

একই কোম্পানির বিভিন্ন ব্র্যান্ড দ্বারা একই ওষুধ-লবণ বাজারে বিক্রির দাম দেখুন।

ব্র্যান্ড নামের ফলে রোগীর নিজের পকেট বুঝে একটি পণ্য বেছে নেওয়ার অধিকার লঙ্ঘিত হয়। যদি ডাক্তার ব্র্যান্ড নামের পরিবর্তে জেনেরিক নামে ব্যবস্থাপত্র লেখেন তাহলে রোগী দোকানে গিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির একই ওষুধের তুলনা করে সর্বনিম্ন দামের জিনিসটি কিনতে পারেন। এমনকি প্যারাসিটামল, লোহা, ইত্যাদির মতো প্রাচীন ওষুধ যাদের কোনো পেটেন্ট সুরক্ষা নেই, সেগুলোও উচ্চদামে বাজারে চলে।

ওষুধ যে কেউ উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ 'প্যারাসিটামল' জেনেরিক নামের একটি ব্যথা কমানোর ওষুধ। এটা কুড়িটিরও বেশি ব্র্যান্ড নামে পাওয়া যায়। Crocin, Calpol, Metacin, Pyrin ইত্যাদি সবকিছুতে প্যারাসিটামল আছে; ক্রেতা যদিও এ সম্পর্কে সচেতন নয়। ড্রাগ কোম্পানি এবং ডাক্তার হয়তো বোঝাবেন যে একটি বিশেষ প্যারাসিটামল অন্যের তুলনায় আরো কার্যকর, কিন্তু এইসব ওষুধে রাসায়নিক হিসেবে একই উপাদান থাকে এবং একই মান নিয়ন্ত্রণ স্ট্যান্ডার্ডগুলিকে মেনে এগুলি তৈরি হয়। একই ভাবে Amivan, Flagyl, Aristogyl ইত্যাদি নামে বিক্রি করা হয় Metronidazole।

ওষুধের বাজার— সব বিক্রেতার লাভ সুনিশ্চিতির বাজার

কেন কেবল বিক্রেতার লাভ? সহজ অঙ্ক, এই দেখুন। একটি প্যারাসিটামল ৫০০ মিগ্রা ট্যাবলেটের উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ পয়সা। একই ওষুধকে ব্র্যান্ডে পরিণত করে এবং বিজ্ঞাপন দ্বারা তার প্রচার করে, ক্রেতার মনে প্রভাব বিস্তার করে, বিক্রি করা হয় যত সম্ভব বেশি দামে। ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি Crocin ব্র্যান্ড নামে একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বিক্রি করে প্রায় ১ টাকা ২০ পয়সায়। কোম্পানিগুলো টেলিভিশনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিজ্ঞাপন দেয় ও অন্য ধরনের বিপণন কৌশলের সাহায্যে ধারণা তৈরি করে যে এটাই সর্বোত্তম। 'অন্য ধরনের বিপণন কৌশল' বলতে প্রধানত ডাক্তারদের হাত করা। ব্র্যান্ডগুলি বাজার দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এবং তার খরচও বর্তায় রোগীর ওপর। ফার্মাসিউটিকাল সেক্টর এইভাবে দরিদ্র ও অসচেতন ভোক্তাদের খরচে বিপুল মুনাফা লাভ করে। ব্র্যান্ড নামের সৃষ্টির ফলেই ওষুধের উচ্চমূল্য, বড় কোম্পানিগুলো দ্বারা মনোপলি এবং ভোক্তাদের বেশি খরচ। ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্রমবর্ধমান তালিকাও বাজারে মনোপলির প্রমাণ দেয়। ধরা যাক Ciprofloxacin-এর ক্ষেত্রে— এটি এ্যান্টিবায়োটিক যা বহু সংক্রমণে ব্যবহৃত হয়। বাজারে বিক্রিত প্রায় অর্ধেক Ciprofloxacin একটি কোম্পানি থেকে আসে, কার্যকর ভাবে ঐ ওষুধটি ব্র্যান্ড লিডার এবং দামে শীর্ষে। এক একটি কোম্পানি, তা Cipla, Alembic বা Glaxo যাই হোক ব্র্যান্ড নেতা হিসেবে বাজারের বিভিন্ন বিপণন কৌশল ব্যবহার করে এবং খুচরো দোকানদারদের বেশি মার্জিন ও ডাক্তারদের প্রচুর উপঢৌকনের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। এইভাবে উচ্চমূল্য রাখা হলেও মানুষ ঐ ব্র্যান্ডটিই কিনতে থাকে। মুক্তবাজারের প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমে এবং বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের দাম কমে এবং বিভিন্ন কোম্পানির একই ওষুধের দাম কাছাকাছি আসে।

এটা জেনেরিক ড্রাগ বাজারের ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে কিন্তু তা ভারতের ব্যক্তি মালিকানাধীন (ব্র্যান্ডেড) ওষুধের বাজারের ক্ষেত্রে সত্যি নয়। এদেশে ব্র্যান্ড নামের দ্বারা তৈরি করা হয় কৃত্রিম মনোপলি। ভারতে বেশিরভাগ ওষুধ প্রেসক্রিপশন এবং ডিসপেনসিং হয় ব্র্যান্ড নামে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হল ওষুধ ব্যবসার 'ট্রেড সিক্রেট'। কোম্পানি যে 'সর্বাধিক খুচরো দাম' (Maximum Retail Price তথা MRP) প্রিন্ট করার একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়, রোগীদের সেই দামে ঐ ব্র্যান্ড কেনা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না। অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ভোক্তাদের মতো রোগী-ভোক্তাদের অন্য কোনো উপায় নেই; কারণ তাঁরা যা কিনবেন তা নির্বাচন তাঁরা নিজেরা করেন না, ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টরা এটা ঠিক করে দেন। তাই যদিও অনেক কোম্পানি একই ওষুধের একই লবণ উৎপাদন করে, কার্যত দাম নিয়ে বাজারের কোনো প্রতিযোগিতা থাকে না। ফলে একই ক্ষমতাসম্পন্ন একই লবণ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ড নামে উৎপাদিত ও বিভিন্ন মূল্যে (MRP) বিক্রি হয়, ও সমস্ত ব্র্যান্ডগুলিই অত্যন্ত উচ্চমূল্যে বিক্রিত হতেই পারে।

অ-অত্যাবশ্যক ওষুধের (non-essential drug) অনাবশ্যক ব্যবহার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রয়োজনীয় ওষুধের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন— 'যে সমস্ত ওষুধ বেশিরভাগ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনকে পূরণ করে; যেগুলি সব সময়েই পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক মাত্রায় ও সঠিক ধরনে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া যায় সেগুলোই প্রয়োজনীয় ওষুধ। WHO ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রয়োজনীয় ওষুধের (Essential Drug List) তালিকা প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালে ভারতে প্রথম প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা (Essential Medicine List) তৈরি হয়। ২০০৩-এ তৈরি যে Essential Medicine List এখন চালু তাতে ৩৪৮টি ওষুধের উল্লেখ আছে। বাজারে চালু এমনকি ডাক্তারবাবুরা লেখেন এমন অনেক ওষুধই অবৈজ্ঞানিক, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক। তবুও ডাক্তাররা কেন লেখেন? প্রথমত, প্র্যাকটিসে নামার পর রোগীর চাপে পড়াশুনার সময় অনেকেই পান না। তখন 'ব্যাগ হাতে বাবু'-রাই (Medical Representative) হয়ে ওঠেন তাঁদের শিক্ষক। তাঁরা কোম্পানির প্রদর্শিত পথে ডাক্তারদের ব্র্যান্ডের উপকারিতা বোঝান। বুঝে হোক, না-বুঝে হোক, উপহার-ইনসেনটিভের লোভে হোক রোগীর ভালোমন্দ না ভেবে ডাক্তারবাবুরা ঐ ব্র্যান্ড লেখেন। এবং রোগীরা তা কিনতে বাধ্য হন। WHO এমনকি MCI-এর Standard Treatment Guidelines-এ স্পষ্ট বলা আছে জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন লিখতে হবে। ২০০২ সালে প্রকাশিত 'Code of Medical Ethics'-এ বলা আছে "Use of generic names: Every physicicn should, as far as possible, prescribe drugs with generic names and he/she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs." (MCI noiification of April 6, 2002)।

বাজারে চালু এমনকি ডাক্তারবাবুরা লেখেন এমন অনেক ওষুধই অবৈজ্ঞানিক, অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক। তবুও ডাক্তাররা কেন লেখেন? প্রথমত, প্র্যাকটিসে নামার পর রোগীর চাপে পড়াশুনার সময় অনেকেই পান না। তখন 'ব্যাগ হাতে বাবু'-রাই হয়ে ওঠেন তাঁদের শিক্ষক।

ভারতে বিক্রিত প্রথম ৩০০টি ব্র্যান্ডের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তার মাত্র ৩৮ % জাতীয় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ তালিকায় আছে। অন্য ৬২ % বেশি দামি বিকল্প ওষুধ যা চিকিৎসাক্ষেত্রে অনাবশ্যক এমনকি অনেক সময় ক্ষতিকারক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকরাও কিন্তু অনেক সময় এইসব অবৈজ্ঞানিক ওষুধ লেখেন।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পরবর্তী সংখ্যায় আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখব, ওষুধ প্রেসক্রিপশন ও বিক্রির প্যাঁচে পড়ে কিভাবে মানুষ আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. শুভজিৎ ভট্টাচার্য, এম বি বি এস, জেনারেল প্র্যাকটিস করেন। বিজ্ঞানসম্মত জনমুখী চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য সতত প্রচেষ্টায় রত এই চিকিৎসক নিজের ক্লিনিকে কম দামে জেনেরিক ওষুধ বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন, এবং হাওড়া জেলায় একটি জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে গড়া ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত।

সুখের ঠিকানা

সুখ নেইকো মনে নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে

আমরা সবাই সুখী হতে চাই। নিজস্ব একটুকরো সুখী গৃহকোণ প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের প্রধান চাহিদা। অথচ সেই সুখটুকু যেন অনেক সংসারেই আজ এক দুর্লভ গুপ্তধনের মতো কোন গোপন কুঠুরিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। অসুখী হবার কোনো কারণ নেই জেনেও, তার সন্ধান খুঁজে পাই না আমরা। হয়তো আর্থসামাজিক বিভিন্ন কারণে আজ মানুষ দিশেহারা। সংকটময় এক অস্তিত্বের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ার ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত মানুষ সুখের চাবিকাঠি খুঁজতে হন্যে হয়ে বাইরে সন্ধান করে ফিরছে। অথচ, সে জানতেও পারছে না তার নিজের কাছেই আছে ভালো থাকার, সুখে ও শান্তিতে থাকার জিয়ন কাঠিখানি। সামান্য কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ আমরা আজকাল আমাদের চেনা শোনার বৃত্তে প্রায়ই শুনতে পাই। দাম্পত্য কলহে আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের কী ভূমিকা আছে সে সম্বন্ধে আলোকপাত করছেন মনস্তত্ত্ববিদ **রুমঝুম ভট্টাচার্য**।

হ্যাপিনেস অর্থাৎ সুখ বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে সুখের সংজ্ঞা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন। এখানে, মানসিক শান্তিকেই সুখ বলে চিহ্নিত করা হল। আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন নিজের অবস্থানে খুশি থাকা ও নিজেদের মানসিক শান্তি বজায় রাখার দায় অনেকটাই আমাদের নিজেদের। ঘটনা সব সময়ে ঘটে চলেছে, কিন্তু তাকে বিচার করার জন্য সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে।

যে সহে সে রহে

একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, আপনার স্বামীকে অফিস চলাকালীন আপনি ফোন করলেন। তিনি ফোন ধরলেন না এবং পরবর্তীকালে আপনাকে ফোন করলেন না। আপনি ভাবতে পারেন তাঁর বিশেষ কোনো বিপদ হল হয়তো। আপনি ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন। উদ্বেগ মাত্রাছাড়া হলে আপনি কান্নাকাটি শুরু করলেন।

আবার আপনি ভাবতে পারেন তিনি ইচ্ছা করে আপনাকে এড়িয়ে চলার জন্য ফোন ধরেন নি। ভেবে আপনি কষ্ট পেলেন। বা আপনার মনে হল তিনি নিশ্চয় আপনাকে ভালোবাসেন না, তাই ফোন করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। আপনার মনে ভীষণ দুঃখ হল। অথচ হয়তো দেখা গেল তিনি বাস্তবে এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর পক্ষে ফোন ধরা বা ফোন করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এদিকে আপনি তো মনে মনে অনেক কিছু ভেবে কষ্ট পাচ্ছেন। তারপর অবশেষে আপনার স্বামী বিকেলের দিকে একটু ফ্রি হতে আপনাকে ফোন করলেন। আপনি তখন ওনাকে অনেক অপ্রিয় কথা বললেন বা কান্নাকাটি করলেন। তখন হয়তো সারাদিনের ব্যস্ততার পরে উনিও ক্লান্ত হয়ে আছেন ও আপনার এই ব্যবহারে উনি রেগে গেলেন বা উত্তেজিত হয়ে আপনাকে কিছু কটু কথা বললেন। আপনি সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তে এলেন যে আপনার ধারণাই ঠিক, উনি আপনাকে পছন্দ করেন না। অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা একটা চক্র হিসেবে কাজ করল। ধরা যাক, অন্য একজন মহিলার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারে। উনি ফোন না পাওয়াতে মনে করতে পারেন কোনো কারণে উনি আজ বিশেষ ব্যস্ত তাই ফোন করতে পারেন নি। একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক, না হলে বিকেলের দিকে আর একবার ফোন করে দেখা যাবে কী কারণে উনি ফোন করতে পারেন নি। এই মহিলার ক্ষেত্রে যখন ওনার স্বামী ফোন করবেন তখন উনি অনেক সংযত ব্যবহার করতে পারবেন। ফলে ওনার স্বামীর ব্যবহারও অনেক সংযত হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘটনা একটাই কিন্তু প্রতিক্রিয়া দুই বা তিন রকম।

এই ছকটি ভালো করে খেয়াল করলে দেখা

ঘটনা	অন্তর্নিহিত চিন্তা বা বিশ্বাস	অনুভূতি	ব্যবহার
স্বামীর ফোন না ধরা বা না করা	সে আমায় পছন্দ করে না বা তার সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা উচিত ছিল	রাগ, দুঃখ বা অভিমান	খারাপ ও অসংযত
স্বামীর ফোন না ধরা বা না করা	বোধহয় খুব খারাপ কিছু হয়েছে। আমার ভাগ্যটাই খারাপ।	মাত্রাতিরিক্ত উদ্বেগ।	কান্নাকাটি করা
স্বামীর ফোন না ধরা বা না করা	হয়তো উনি ব্যস্ত আছেন। পরে নিশ্চয় যোগাযোগ করবেন।	সামান্য চিন্তা বা অপেক্ষা। পরে ফোন করে খবর নেওয়ার চিন্তা।	সংযত ব্যবহার

যাবে, আমাদের অনুভূতি ও ব্যবহার তিনটি ক্ষেত্রে আলাদা হচ্ছে কারণ ঘটনা সরাসরি অনুভূতি তৈরি করছে না। এই অনুভূতি ও ব্যবহার আলাদা হচ্ছে সম্পূর্ণ আমাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের জন্য। এর দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। ঘটনা সব সময়ে ঘটে চলেছে বা ঘটবে কিন্তু তাকে বিচার করার জন্য সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে।

ওগো নিরুপমা করিও ক্ষমা

আসুন দেখা যাক, উপরোক্ত তিন ধরনের ব্যবহারের মধ্যে কোন ব্যবহারটি সমস্যার (যদি কিছু থেকে থাকে) সমাধানে উপযোগী। প্রথম দুটি ব্যবহার সমস্যাকে আরো জটিল করে তুললো। তিন নম্বর ব্যবহারটি সমস্যা থাকলে তাকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে বিশেষ সহযোগী হতে পারে। যদি সত্যি আপনার স্বামী আপনাকে পছন্দ না করেন চেঁচামেচি করলে সে সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। মোদ্দা কথা হল, অনেক সময়ই আমরা ভুল চিন্তা বা বিশ্বাসবশত অযৌক্তিক ব্যবহার করে ফেলি। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের নেতিবাচক প্রক্ষোভগুলি আমাদের জীবনে অবশ্যই থাকবে কিন্তু তা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন আমাদের ব্যবহার বা আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে এবং তা আমাদের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আর একটা কথা আমাদের নিজেদেরকে শেখাতে হবে— প্রত্যেকটি মানুষ দোষেগুণেই মানুষ। আমরা নিজেরাও দোষেগুণে মানুষ। অন্যের বা নিজের সামান্য দোষত্রুটি বড় করে না দেখে কিছুটা অগ্রাহ্য করতে পারলে শান্তি বা সুখ যাই বলি না কেন তার সন্ধান সহজেই পাওয়া যায়। আর সমস্যা যদি গভীর হয় সেক্ষেত্রে রাগ বা বিষাদগ্রস্ত হয়ে সে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এতে সুখ আরো দূরে চলে যায়, আসে অশান্তি। তাহলে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল— ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের নেতিবাচক প্রক্ষোভের জন্য দায়ী নয়। আমাদের ভুল বিশ্বাস ও নেতিবাচক চিন্তাই সেজন্য দায়ী।

কয়েকটি সাধারণ নেতিবাচক চিন্তার সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

১. Black and White Thinking (All or Nothing Thinking)— জীবন কেবল ভালো বা খারাপ ঃ এই ধরনের চিন্তায় আমরা মনে করি কোনো ঘটনা বা আচরণ সম্পূর্ণভাবে ভুল বা সম্পূর্ণভাবে ঠিক। আমি সম্পূর্ণ ঠিক, আমার স্বামী সম্পূর্ণ ভুল। অথবা আমি পুরোপুরি ব্যর্থ। প্রকৃতপক্ষে, তা কখনোই সম্ভব নয়। আমরা সবাই দোষেগুণে মানুষ। জীবন সবসময় আমাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। আজ যা ভুল কাল তাকে সংশোধন করে সঠিক পথে চলার নাম জীবন।

২.Overgeneralization— অতিসাধারণীকরণঃ এই ধরনের চিন্তায় আমরা কোনো একটা ঘটনার থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। যেমন, আমার স্বামী ফোন ধরলেন না। উনি কখনোই সময়ে যোগাযোগ করেন না। বা হয়তো উনি কোনো কারণে বাড়ি ফেরার সময়ে আপনি ওনাকে যা আনতে বলেছেন তা ভুলে গেলেন। আপনি চিন্তা করলেন উনি কোনোদিনই আপনার কথার গুরুত্ব দেন না।

৩. Catastrophising — খুব খারাপ কিছু যেন ঘটবেই ঃ এই ধরনের চিন্তায় আমরা প্রথম থেকেই ধরে নি ভালো কিছু হবার নেই। যা হবে সব খারাপ হবে এবং তা আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না, আমি এই খারাপ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবো না।

৪. Mental Filter— নেতিবাচক দিকটাই শুধু দেখা ঃ এই ধরনের চিন্তায় আমরা কোনো ঘটনা বা কোনো মানুষের নেতিবাচক দিকগুলির ওপর বেশি জোর দিই। বাস্তবে, দেখা গেছে প্রতিটি মুদ্রার দুটি দিক আছে। ইতিবাচক দিকগুলি অগ্রাহ্য করে জীবনের ত্রুটিবাচক দিকগুলির ওপর জোর দেওয়া চিন্তাশক্তির ত্রুটি।

৫. Magnifying or Minimising (Binocular Vision)— বেছে বেছে দেখা ও না দেখা ঃ এই ধরনের চিন্তা বলতে আমরা তিলকে তাল করা বুঝি। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের বা অন্যের দোষত্রুটিগুলিকে খুব বড় করে দেখি আর ভালো গুণগুলিকে লক্ষ্য করতে অসমর্থ হই।

৬. Personalisation and Blame— ব্যক্তিই দায়ী ঃ এই ধরনের ভুল চিন্তার বশবর্তী হয়ে আমরা খারাপ কিছু ঘটলে তার দায় সম্পূর্ণরূপে নিজের কাঁধে তুলে নি নতুবা সম্পূর্ণভাবে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করি। উদাবরণ, আমার স্বামীর সঙ্গে বিরোধ বাঁধলে তার জন্য উনিই দায়ী। আমার বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গেল তার জন্য আমিই দায়ী।

৭. Labelling and Mislabelling তকমা আর ভুল-তকমা ঃ এই ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের বা অন্যের গায়ে একটা নামের তকমা এঁটে দিতে চাই। যেমন, আমি একটা বোকা। সে ভীষণ বদমাইশ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোনো একটি ঘটনার উপর ভিত্তি করে বা অনুমান করা কোনো ঘটনার ভিত্তিতে এতবড় সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এই ধরনের ভুল চিন্তার ফল।

৮. Jumping to Conclusions— ঝপ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঃ এই ধরনের চিন্তা আমাদের জীবনে অনেক সময় দাম্পত্য কলহ ডেকে আনে। উদাহরণ, স্বামী ভালোবাসে না তাই আমি ফোন করা সত্ত্বেও ফোন রিসিভ করল না। অর্থাৎ খুব সহজেই একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।

আমরা যখন কোনো অপ্রিয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হই তখন এই নেতিবাচক চিন্তাগুলি মাথায় আসা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু আমরা যদি এই চিন্তাগুলি সঠিকভাবে চিনে নিতে পারি ও এগুলি সরিয়ে নতুন ইতিবাচক চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে কঠিন থেকে কঠিনতর সমস্যা অনায়াসে মোকাবিলা করার শক্তি পেতে পারি। এই প্রতিস্থাপনের বিষয়টি বারংবার অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে আর এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন অভিজ্ঞ মনোবিদ।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিজ্ঞানী। পরামর্শদাতা হিসাবে কর্পোরেট সেক্টরে কাজ করেন। যুক্ত আছেন এন জি ও-র সঙ্গে।

স্মরণে

শ্যামলীদি

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে যতটুকু নেন, ফিরিয়ে দেন অনেক বেশি। এমনই একজন মানুষ শিল্পী, ভাস্কর, পরিবেশ কর্মী শ্যামলী খাস্তগীর— অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণা করেছেন পরিবেশ কর্মী **প্রদীপ দত্ত**।

ঠিক ৩০ বছর আগে, ১৯৮২ সালের ৬ই আগস্ট বিজ্ঞান ও সমাজকর্মীদের উদ্যোগে কলকাতায় এক বড়সড় পরমাণু অস্ত্রবিরোধী মিছিল ও সমাবেশ হয়েছিল। বৃষ্টি মাথায় করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে সকলে মিলে গিয়েছিল শহীদ মিনারে। ঠিক ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের দল সেখানে গান গাইবে। অঝোর বৃষ্টিতে গানের অনুষ্ঠান পণ্ড হল। কীভাবে খবর পেয়ে শান্তিনিকেতন থেকে শ্যামলীদি এসেছিলেন। সঙ্গে করে আনা লিফলেট ও পুস্তিকা বিলিয়েছিলেন। অনেক পরে জেনেছি শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে ফিরে আসার আগে আমেরিকার যুদ্ধসজ্জার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৯৭৭ থেকে ৮১-র মধ্যে কয়েকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। একবার কয়েক মাসের জন্য। একবার ছেলে শিশু আনন্দ সহ। আনন্দের কাছে শুনেছি, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার থেকে উত্তর আমেরিকা আসতেন শুধু পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মামুলি অংশগ্রহণের জন্যই শুধু নয়, জোরালো প্রতিবাদ করে গ্রেফতার বরণে অনেকেই অনিচ্ছুক বলে শ্যামলীদি থাকতেন প্রথমে। এক সমাবেশে প্রতিবাদীরা বুঝে নিতে চাইছিলেন, নিজেদের মধ্যে কজন গ্রেফতার বরণে রাজি। প্রথমেই শ্যামলীদি আনন্দের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। তা দেখে আর এক মার্কিন মহিলাও এগিয়ে এলেন। মার্কিন প্রশাসন কয়েকবার তাঁকে ডিপোর্ট করেছে, তবে তাড়িয়ে দেয় নি।

সে বছরই শ্যামলীদির ডাকে পৌষমেলায় শান্তিনিকেতনে গেলাম আমি আর জ্যোতি (ডা. জ্যোর্তিময় সমাজদার)। শ্যামলীদির আঁকা যুদ্ধবিরোধী ছবি আর পোস্টার দিয়ে স্টল সাজিয়ে লিফলেট নিয়ে বসেছিলাম। সেবার 'পলাশ' বাড়িতে মাটির পাত্রে খিচুড়ি আর লাবড়া খেয়ে আমরা তো মুগ্ধ। তারপরে এমনই ভাব হল যে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় পৌঁছে সোজা আমার অফিসে চলে আসতেন, শহরে এসেছেন সেকথা জানাতে। সে সময় শ্যামলীদির পুরো নাম ছিল তান শ্যামলী খাস্তগীর।

তখন ফোনের এত চল ছিল না। আমার বা শ্যামলীদির বাড়িতেও ফোন ছিল না। যোগাযোগের উপায় চিঠি লেখা, নয়তো সশরীরে হাজির হওয়া। পোস্টকার্ড পাঠাতেন কখনো, তাতে লেখা কম আঁকা বেশি। বিদেশ থেকে পাঠানো চিঠি পেয়ে জেনেছি তিনি শান্তিনিকেতনে নেই। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে আচমকা বাড়িতেও হানা দিতেন। শ্যামলীদির কাঁধে থাকত জামা-কাপড়, বইপত্রের একাধিক ব্যাগ এবং স্লাইড প্রোজেকটার। সুযোগ পেলেই হিরোশিমার স্লাইড দেখাতেন। পরে যোগ হয়েছিল রাজস্থানের রাওয়াতভাটা পরমাণুচুল্লির কাছের গ্রাম বারদুনিতে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের ছবির স্লাইড। আরও পরে যাদুগোড়ার আক্রান্ত অসহায় মানুষের ছবি ও ভিডিও। আশির দশকের গোড়ায় শ্যামলীদি ও দুই ডাক্তার বন্ধুর প্রভাবে আমার পরমাণু অস্ত্র ও শক্তি বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল।

সেই থেকে কলকাতায় আমাদের হিরোশিমা দিবস পালন শুরু হয়। শ্যামলীদি আসতেন, সে সময় নানা জায়গায় এ বিষয়ে বলতে যেতেন। অনেক পরে তাঁর উদ্যোগে শান্তিনিকেতনেও ওই দিবস পালন শুরু হয়। অথচ আদতে তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর। কানাডায় এবং কলকাতায় অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ তাঁর শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হয়েছে। তারপর নানা সামাজিক আন্দোলনে বেশি বেশি অংশগ্রহণের ফলে ধীরে ধীরে শিল্পচর্চা অবহেলিত হয়েছে।

১৯৮৮ সালে তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুলে মেডিকো ফ্রেন্ড সার্কেলের এক মিটিং-এ ঠিক হল রাজস্থানের রাওয়াতভাটা পরমাণুচুল্লির সংলগ্ন এলাকার মানুষের বিচিত্র অসুখ ও ক্যানসার রোগের বৃদ্ধি নিয়ে সমীক্ষা চালানো হবে। মিটিং-এ শ্যামলীদি উপস্থিত ছিলেন না, আমি ছিলাম। কিন্তু সমীক্ষার সময় শ্যামলীদি গেলেন, আমি যেতে পারলাম না। অসুস্থ মানুষের ছবির স্লাইড তৈরি করে আনলেন। স্লাইড ও প্রোজেকটার সঙ্গে রাখতেন, সুযোগ পেলেই দেখাতেন পরমাণু বিদ্যুতের উজ্জ্বল ছবির আড়ালে কী ঘটে।

১৯৮৯ সালে কলকাতায় পরমাণু শক্তির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সারাদিনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের পরমাণু শক্তি সংস্থার কয়েকজন কর্তাব্যক্তিও বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু বিদ্যুতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিকাশ সিংহ বক্তব্য রাখার পরই সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। শ্যামলীদি ও আরতিদি তাঁর পিছু ধাওয়া করলেন। একি কথা, আমাদের বক্তব্য শুনুন, প্রশ্নের উত্তর দিন। বিকাশবাবু সেবার কোনওক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। কনভেনশনের কয়েক মাস পর থেকে প্রকাশ শুরু হয় সেফ এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ত্রৈমাসিক, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত তা চলেছিল। শ্যামলীদি বেশ কয়েক কপি নিয়ে বিক্রি করতেন, পত্রিকার সদস্য করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় বললেন, যাদুগোড়া যাবে নাকি, আমি যাচ্ছি। তারপর থেকে সেখানে কয়েকবার গেছেন। অনুমুক্তি পত্রিকার সুরেন্দ্র আর সংঘমিত্রা গাদেকার যে সময় সমীক্ষার কাজে যাদুগোড়া এলেন, শ্যামলীদি বেশ কিছুদিন সেখানে ছিলেন। বেশ কয়েকবছর আগে হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে তেজস্ক্রিয় দূষণে আক্রান্ত যাদুগোড়া ও সংলগ্ন এলাকার তেজস্ক্রিয় দূষণে আক্রান্ত কয়েকশো অসুস্থ ও বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েকে একত্রিত করে ইউরেনিয়াম মাইনিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আক্রান্ত ছেলেমেয়ে ও মানুষের ছবি তুলে এনে সবাইকে দেখাতেন। ওই অসুস্থ, বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিতে পারে এমন কিছু স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য তিনি নানা মহলে আবেদন করেছেন। কেউ এগিয়ে আসে নি।

নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে পান্নালাল দাশগুপ্ত সহ দু তিনজন অকৃতদার বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কয়েক বছর তাঁদের নিয়ে তুমুল ব্যস্ত ছিলেন। একবার পান্নাবাবুকে নিয়ে তাঁর হাতিবাগানের বাড়িতে উঠে খবর পাঠালেন। পান্নাবাবুর সঙ্গে আলাপ করে তাঁর বড় সাক্ষাৎকার নিলাম। বর্ষাকালে শ্যামলীদির রান্না খিচুড়ি, পাপড় ভাজা সহযোগে মধ্যাহ্নভোজনও হল। এর অল্প কয়েক দিন পরই পান্নালালবাবু মারা গেলেন। আলাপের সময় দেখে মনে হয় নি চট করে তিনি চলে যেতে পারেন। পরে তাঁর কোনো আত্মীয়ের সমালোচনা অভিযোগে মানসিক ক্লান্তি এসেছিল। কিন্তু তাতে কী, সারা জীবনেই শ্যামলীদি তো অন্যের সেবা করে এসেছেন। লেখা-পড়ায় বিঘ্ন হত, অনুযোগও করেছেন। কিন্তু সে কাজ থেকে সরে আসতে পারেন নি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার ১৯৮৭, ২০০০, ২০০৬ সালে তিন দফায় যথাক্রমে দাঁতন, সুন্দরবন ও হরিপুরে পরমাণু কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বিশেষ করে ২০০০ ও ২০০৬-০৭ সালে সরকার অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমরাও তেড়েফুঁড়ে সভা-সমিতি-মিছিল, লেখালেখি শুরু করি। বিরোধিতায় শ্যামলীদি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে, নানা সভা-সমিতিতে ছুটতেন। ২০০০ সালে ক্যানিং-এ দিনের বেলা সভার পর কলকাতায় ফেরার জন্য ছুটছি, বিকেলে কলকাতায় সভা। প্লাটফর্মে ট্রেন আসতে দেরি নেই। তাড়াহুড়োয় লাইন টপকে প্লাটফর্মে উঠছি। শ্যামলীদিও সমানে পাল্লা দিচ্ছেন। শেষে ব্যাগ-বোঁচকা সহ হাত-পা-শরীর কাজে লাগিয়ে প্লাটফর্মে উঠলেন। আমরা হতবাক-লজ্জিত। ট্রেন ধরার তাড়ায় সব ভুলে গিয়েছিলাম। শ্যামলীদি নির্বিকার। এখনও চোখ বুজলে দৃশ্যটা চোখে ভাসে, অনুশোচনা হয়। নাই বা ধরতাম সেই ট্রেন।

২০০০ এবং ২০০৬-০৭ দু দফাতেই সরকারকে পিছু হঠতে হয়েছিল। অবশেষে মমতা সরকার ঘোষণা করল হরিপুরে তো নয়ই, পশ্চিমবঙ্গের কোথাও পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে না। তাতে আমাদের কাজ কমলেও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। কারণ ভারত সরকার নানা রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ বিকাশের জোর চেষ্টা চালাচ্ছে। তার প্রতিবাদ করতে হচ্ছেই। গত এপ্রিল মাসে চেরনোবিল দিবসে কলকাতায় মেট্রো চ্যানেলে পরমাণু বিদ্যুতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় শ্যামলীদি এসেছিলেন। ততদিনে লাঠি ধরেছেন। বিচ্ছিরি ভাবে পা ফুলেছে। বললেন, পোকা কামড়েছে। অল্প সময়ে সুন্দর বললেন, সভা শেষে লেক গার্ডেন্সে সুমিত্রাদির বাড়ি যাবেন। তাঁকে নিয়ে মেট্রো ধরতে যাচ্ছি। সবাই রে রে করে উঠল— ট্যাক্সি করে যাও। বললেন, কষ্ট হলেও একটু হাঁটা বোধহয় দরকার। কতটা কষ্ট চেয়ে চেয়ে দেখলাম। শেষে রবীন্দ্র সরোবরে যাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে না হয়, টালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি নিলাম। অসুস্থ হবার পর দুর্গাপুরের হাসপাতালে জেনেছিলাম, শ্যামলীদির পায়ে ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস হয়েছে, পোকার কামড় নয়। এখন ভাবি কতটা মনের জোর থাকায় সেই পা নিয়েও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছুটে বেড়ানো জারি রেখেছিলেন।

পরের দিন আমাদের ঘরে এলেন। আলোচনা, গল্প-গুজবের ফাঁকে আমার মেয়েকে রঙিন কাগজ কেটে সুন্দর পাখি, ফুল, নকশা বানিয়ে দিলেন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে খালি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। এটাই আমার শ্যামলীদিকে নিয়ে শেষ সুখের স্মৃতি।

৪ঠা জুন শিয়ালদার লরেটো ডে স্কুলে নাট্যকার বাদল সরকারের স্মরণ সভায় এলেন। পরের দিন ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ওই স্কুলেই পরমাণু শক্তির বিপদ নিয়ে সারাদিনের কর্মশালা। সেখানে গান্ধীজিকে নিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের বই প্রকাশ করলেন। তারপর সারাদিন ধরে নানা জনের বক্তব্য শুনলেন, বললেন। হল ভর্তি, ঘর ভর্তি শ্রোতা নিয়ে পর পর দু দিনের অনুষ্ঠানের পর তাঁকে মানসিক ভাবে অনেক চাঙ্গা মনে হল। অসুস্থ হবার আগে সেই শেষ দেখা।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর নানা বেঠিক কাজ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, পাঁচিল তোলার বিরুদ্ধে আপ্রাণ লড়েছেন। এসব কারণেই নিরঞ্জনদা (হালদার) তাঁকে বলতেন শান্তিনিকেতনের বিবেক, সমরদা (বাগচী) বলতেন সেখানকার হৃদয়। ঘনিষ্ঠ এক মহলে 'মমতা' নামটাও চালু হয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা তাঁর মজ্জায় মিশেছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাতে কখনো উগ্রতার ঝাঁঝ ছিল না। ভালো-মন্দ-পছন্দ-অপছন্দে আপসও ছিল না। ভোগ বিলাস এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র ঘৃণা। পাঁচিল তোলা নিয়ে লড়াই জারি রেখেই অসুস্থ হলেন।

শান্তিনিকেতনের 'পলাশ' বাড়িতে গেলে গাড়ি ভাড়া করে সারাদিনের জন্য নানা জায়গায় নিয়ে যেতেন। কখনো পান্নাবাবুর প্রেরণায় বন্যার হাত থেকে বাঁচতে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে গড়ে তোলা মাটির পাহাড় দেখাতে, নানা জনের সঙ্গে আলাপ করাতে। কখনো গায়ত্রীদেবী স্পীভাক ও মহাশ্বেতা দেবীর উদ্যোগে পরিচালিত পিছিয়ে থাকা মানুষদের স্কুলগুলো কেমন চলছে তার খোঁজ নিতে, দেখাতে। ২০০০ সাল নাগাদ আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া উপলক্ষে নিজের বাড়িতে পরমাণু শক্তি নিয়ে আলোচনা ডেকে বসলেন। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল।

'পলাশ' বাড়িতে শ্যামলীদির পাশের ঘরে দীর্ঘদিন ছিলেন বিশ্বভারতীর জাপানি ভাষার অধ্যাপক মাকিনো— তাঁর মেয়ে বউ সহ। নানা সময় শ্যামলীদি কয়েকজন ভালো মানুষকে তাঁর পাশের ঘরে নিখরচায় থাকতে দিয়েছেন। বাড়িতে অতিরিক্ত থাকার জায়গা রয়েছে, ভালো মানুষেরা

থাকবে, ভাড়া কিসের!

যাঁরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছেন, থেকেছেন তাঁরা সাক্ষী, রান্নার হাত ছিল অসাধারণ, অভিনব। একবার দুপুরে খাওয়ার সময় শাক খেয়ে খুবই ভালো লেগেছে, বুঝলাম না কী শাক। বললেন, সকালে কুলেখাড়ার রস খেলাম, শাকটা ফেলে না দিয়ে রেঁধে ফেললাম, খারাপ হয়েছে? আমি তো মুগ্ধ। সবজির চোকলা ফেলে না দিয়ে বেটে, নুন, কারিপাতা, লেবুর রস সহযোগে তা যখন পরিবেশন করতেন, স্বাদে-গন্ধে অনবদ্য। কে বলবে সবজির চোকলা আবর্জনার বাক্সে ফেলে না ফেলে তা দিয়েই তৈরি। লেমন গ্রাসের চা তাঁর হাতেই প্রথম ও শেষ খেয়েছি।

গান্ধীবাদী বলতে একমাত্র শ্যামলীদিকেই দীর্ঘদিন কাছ থেকে দেখেছি। অ-পারমাণবিক, ক্রেডিট-কার্ডহীন, বড় বড় মলহীন, কম প্রয়োজন, অল্পে তুষ্ট, সামাজিক ন্যায়ে অভ্যস্ত পৃথিবীর স্বপ্ন বুকে ধরে রেখে অমিতব্যয়ী, ভোগবাদী, স্বার্থপর দেখানেপনায় তৃপ্ত বাস্তব পৃথিবীতে কখনো একা হতে হতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখেছি। একদিন অনেক রাত পর্যন্ত সেই অবসাদের কথা আমাদের বলছিলেন। কথা প্রায় একতরফাই চলছিল। অসহায় ভাবে সেইসব কথা শুনতে শুনতে, অন্যায় হলেও, আমার চোখ ভরে ঘুম এল। আমার স্ত্রী আরও রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে জেগে রইলেন। শান্তিনিকেতনের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির আচার-ব্যবহার, চাল-চলনে কত যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল তা সেদিন টের পেয়ে ভয় পেয়েছিলাম। কারণ বড়সড় বাড়িতে একা থাকেন, এত বেদনা মনে অবসাদ তৈরি করবে— তাই স্বাভাবিক।

অন্যায়ের প্রতিবাদে ভয়হীন, নানা স্থানে ভালো কাজে মদত দিতে ছুটে বেড়ান। বড় মাপের মানুষটিকে দেখতে দেখতে তাঁরও যে দুঃখ আনন্দ রয়েছে তা ভুলে গিয়েছিলাম। যেন সে সবে আমাদেরই একচেটিয়া অধিকার। খবরের কাগজ রাখতেন না, টিভি ছিল না। কারণ চুরি, লোভ, হিংসা, অত্যাচার আর দুর্নীতির খবরে তাঁর মন খারাপ হয়। ফলে প্রতিদিন চারপাশের ঘটনা ও খবরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। তাতেও মন খারাপ হয়। গান শোনারও সুযোগ ছিল না। আমার স্ত্রী বললেন, ওঁকে একটা রেডিও কিনে দিলে হয়। তাতে হয়ত ভোরবেলা মন ভালো হবে। দু'একবার রেডিও শুনতে শুনতে অতি সকালে ফোন করলেন শ্যামলীদি। রেডিও শুনছি, তাই ফোন করলাম।

হঠাৎ এক রবিবার দুপুরে ফোনে খবর পেলাম শ্যামলীদি অসুস্থ, তাঁকে উডল্যান্ড নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হচ্ছে। আসার পথে গাড়ি থেকে বিশ্বভারতীর এক শিক্ষক ফোন করেছেন। তখনই আমাকে উডল্যান্ডে চলে যেতে হবে। কারণ আমিই হব তাঁর জিম্মাদার। সে সময় 'পরমাণু চুক্তি নয়— নবীকরণযোগ্য শক্তিই ভরসা' বইটির কাজে তুমুল ব্যস্ত ছিলাম। চুক্তি সম্পন্ন হতে চলেছে অথচ বইটির কাজ হয়ে ওঠেনি। ২০০৭ সালের শেষার্ধে ছুটির দিনে বাংলা কম্পোজিটারের পাশে বসে রয়েছি। বললাম এখনি যেতে পারছি না, ভর্তি করে দিন, কাল যাব।

পরের দিন যেতে যেতে বিকেল হল। রাস্তায় সুমিতার ফোন পেলাম। আপনি কোথায়? কখন আসছেন? অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছালাম। দেখি বিশিষ্ট এক মহিলা নাট্য ব্যক্তিত্ব, সুমিতা এবং আরও এক বন্ধুর সঙ্গে বাইরে অপেক্ষায় রয়েছেন। কথা হল। জানলাম দু-তিন দিন আগে শ্যামলীদি তাঁকে ফোন করে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর কাছে খোঁজ নিচ্ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কিনা। উডল্যান্ডে আকস্মিকভাবে লাল্টুকে (ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী) পেয়ে শ্যামলীদির শরীরের কথা বিস্তারিত জানালাম। পরের দিন সকালেই ছেলে আনন্দ এলো। সে যাত্রায় দু-চার দিন হাসপাতালে থেকে মুক্তি পেলেন।

২০১১-র জুলাইয়ের শেষে হাসপাতালের বিছানায় অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থাতেও যতক্ষণ জ্ঞানে ছিলেন বারবার বলেছেন, ভালো আছি। দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে ভর্তি হবার দিন কয়েক পর থেকে ধীরে ধীরে কথা বলা বন্ধ হয়ে আসছিল। ভর্তি হবার কয়েক দিন পর গিয়েছিলাম। একদিন হাত ধরে অনেক কথা বলার চেষ্টা করলেন। কথা জড়ানো, কিছুই বোঝা গেল না। এই স্বাধীনচেতা, অকুতোভয় মানুষটি যে আর থাকবেন না তখনো মনে হয় নি।

দুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে ১৫ই আগস্ট ফোন পেলাম, শ্যামলীদি আর নেই। রাতে নাইটিঙ্গেলে পৌঁছে নাইজেলকে দেখলাম। আটাত্তর বছরের নিরঞ্জনদাকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেবার শত অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই বাড়ি ফিরতে চাইলেন না। বললেন, ওঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবার পরেই যাব। অসংখ্য ছারপোকার কামড় খেয়েও পড়ে রইলেন। অন্ধকার না কাটতেই পরের দিন সমরদা পৌঁছে গেলেন। আনন্দ, নাইজেল, জ্যোর্তিময় ও আমি শ্যামলীদির দেহ নিয়ে শান্তিনিকেতন রওনা হলাম।

পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত নাইজেল গান ধরল— জয় তব বিচিত্র...। মাঝখানে শুয়ে শ্যামলীদি, ওরা তিনজন অবিরাম রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিল। এবার নাইজেল একাই একটা গাইল একটি গান— আনন্দ বা জ্যোর্তিময় সে গানের সুর জানে না। অনেক কষ্টে জেনেছিলাম নাইজেল ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক। বাংলায় বললেন, 'ওদ্যাপক'। শান্তিনিকেতনের গাছ পাথর (ফসিল) নিয়ে গবেষণা করছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শ্যামলীদির বেশ কয়েক বছরের বিশেষ অনুরাগী। ওকে দেখে মনে হয় আমেরিকা তত খারাপ দেশ নয়। পথে একবার চা খেয়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

জীবনের শেষদিকে শ্যামলীদি ঘন ঘন পাঠভবনে যেতেন, ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলতেন। পাঠভবনের সারিবদ্ধ ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে তাঁর দেহ রাখা হল। দুটি সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীতের পর অস্থায়ী উপাধ্যক্ষ উদয়নারায়ণ সিংহ জানালেন প্রকৃতি সেবিকা শ্যামলীদিকে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মাটিতে কবর দিয়ে তার উপর একটি কুলগাছ পুঁতে দেওয়া হবে, গাছ বড় হলে তাঁর সাধ অনুযায়ী সেখানে বাচ্চারা হুটোপাটি করে কুল খাবে।

তারপর তাঁর দেহ এল 'পলাশ' বাড়িতে। দেহ প্রবেশমাত্র সুললিত মহিলা কণ্ঠে গান শুরু হল, চলল শেষ পর্যন্ত। ''দুই হাতে কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'' গানটা শুনে মনটা হু হু করে উঠল। কথাগুলো যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

বেলা পড়তে সবাই মিলে মিছিল করে রাস্তার মোড় পর্যন্ত এলাম। তারপর কঙ্কালিতলা শ্মশানে না গিয়ে কয়েকটি গাড়িতে করে তাঁর দেহ নিয়ে চললাম বীরভূমের কুরুম্বা পোস্ট অফিসের অধীনে তিলুটিকার উদয়ন কল্যাণ কেন্দ্র আশ্রমের উদ্দেশ্যে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৬০ সালে তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এনামুল হক। তার আগে ১৯৪০ থেকে '৫৬ পর্যন্ত সেখানে ১৮টা পরিবারের যৌথ খামার ও কমিউন চালু ছিল তাঁরই নেতৃত্বে। আশ্রম মানে খোলামেলা একতলা মাটির বাড়ি, একপাশে রয়েছে এনামুল হকের

কবর— ১৯৯৩ সালে তিনি মারা যান। অন্যদিকে তাঁর পারিবারিক জমিতে পাশাপাশি শায়িত রয়েছেন গোয়ালডির ইসলাম শেখ এবং কুরুম্বার শান্তিরাম সর। তাঁদের পাশে শ্যামলীদির দেহ থাকবে।

এনামুল বলতেন সমস্ত মানুষের একটা জাত 'মানুষ'। তার ধর্ম হল মানবতা। বলতেন, এই পৃথিবী ভালোবাসার কাঙাল, তাই প্রয়োজন ভালোবাসার পৃথিবীকে আপন করে নেওয়া। তা যে করে সেই মনুষ্যত্ব গুণান্বিত মানুষই হলেন 'দেবতা'। উদয়ন কল্যাণ সঙ্ঘে পূজো নেই যাগযজ্ঞ নেই। যাঁরা তা সঠিক বলে মনে করলেন তাঁদের নাম পাল্টে উপাধিবিহীন নতুন নামে পরিচয় শুরু হয়। ফলে হিন্দু মুসলিম একাকার হয়ে যায়।

আজ সেখানে একটি গাছকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে একটি চাতাল। সেখানে রাখা হল শ্যামলী খাস্তগীরের দেহ। বেদ ও কোরাণ থেকে সংক্ষিপ্ত পাঠ হল। কোরাণ পাঠের শেষে বৃদ্ধ আব্দুল হালিম বললেন, শ্যামলী এখানে আসতো, আমার পাশে বসতো। তারপর অশ্রুসজল কণ্ঠে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আউড়ে বললেন— একি উঠেছে হাওয়া, পরে এসে আগে চলে যাওয়া...

তিলুটিয়া গ্রামের দিকে গাড়ির মিছিল যেতে দেখে কৌতূহলী বাউল দিবাকর দাস জানতে পারেন শ্যামলীদি নেই। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে দোতারা নিয়ে এখানে এসে হাজির তার প্রিয় দিদির দেহের পাশে। তিনি গাইলেন—

একদিন মাটির নীচে হবে ঘর রে মন আমার
কেন বাঁধিস দালান ঘর
রক্ত, মাংস, চর্মচক্ষু, মুণ্ড, মেরুদণ্ড
হবে তোমার খণ্ড খণ্ড...

যতক্ষণ মাটি খুঁড়ে কবর তৈরি, ইঁটের দেওয়াল তোলার কাজ চলল, দেবু দফায় দফায় গান গাইলো।

নাইজেল ছাড়া আরও চারটি দেশের মেয়ে কোথা থেকে খবর পেয়ে বহু দূর থেকে কিভাবে যেন এখানে ছুটে এসেছে। এঁদের কাছে 'ভারত' মানে যেমন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন, ভারত মানে শ্যামলী খাস্তগীরও।

উদয়ন কল্যাণ সংঘের রীতি মৃতদেহ নিয়ে এলেও দুপুরে শ্রী বিশ্বজিতের ঘরে ভাত খেতে হবে। দেহ রেখে কয়েক দফায় আমরা জনা যাটেক মানুষ বিউলির ডাল, আলুপোস্ত আর ভাত খেলাম। তারপর বেলা গড়ালে আনন্দ ও নাইজেল কবর প্রস্তুত ও তাঁকে কবরস্থ করার কাজে হাত লাগালো।

অল্প কিছু মানুষ আছেন যাঁরা পৃথিবীর কাছ থেকে যতটুকু নেন, ফিরিয়ে দেন অনেক বেশি। অনেক পাবার সুযোগ থাকতেও এত অল্পে জীবন কাটান যা দেখে আমরা শিখি, সুন্দর, সুস্থভাবে বাঁচতে অনেক কিছু লাগে না, দৃষ্টি বড় করাটাই আসল কথা। অনেক সুযোগ সম্মান তাঁরা এড়িয়ে চলেন। শ্যামলীদির ক্ষেত্রে যোগ হয়েছিল আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীকে পরমাণু মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা ও জেহাদ, পরিবেশ ও ন্যায়ের আন্দোলনে সামিল হওয়া, অল্প কথা সুন্দর করে বলা, অন্যের যত্ন নেওয়া, অতিথি সেবা। এইভাবে শিল্পী শ্যামলী খাস্তগীর হয়ে উঠেছিলেন আমাদের অন্তরের শ্যামলীদি। একদিন তাঁর নিজের আঁকা এক ছবি উপহার দিয়েছিলেন আমায়। উদাস বাউল উদাত্ত কণ্ঠে প্রতিবাদের গান গাইছে। ভালোই হয়েছে ঘরে টাঙানো ছবিটার দিকে তাকালে একটা মানুষের মত মানুষের জীবনের খাতা চোখের সামনে খুলে যায়। উপায় কি! এখন তিনি এভাবেই বেঁচে থাকবেন আমার স্মৃতিতে আমার সঙ্গে— যতদিন বাঁচবো।

লেখক পরিচিতি : প্রদীপ দত্ত বিজ্ঞানকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গ গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক অগ্রণী সংগঠক। সুদীর্ঘ তিন দশক ধকে তিনি পরমাণু শক্তির ভালো-মন্দ নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন, লিখেছেন অজস্র প্রবন্ধ।

সাধারণ অসুখবিসুখ ও ওষুধবিষুধ সম্বন্ধে
জানতে পড়ুন—

ওষুধবিষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিত্যসঙ্গী হাতিয়ার

সংগ্রহ করবার ঠিকানা :
কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মেডিসিনাল ইউনিট
৮৬সি, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
ফোন : ২২৬৫-২৩৬৩

চলচ্চিত্রে ডাক্তার

ধ্বংসের মুখোমুখি ডাক্তার

এক ডক্টর কি মওত

অংশুমান ভৌমিক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। অনেকের কাছে তিনি ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা’-র কবি। ‘কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?’ এই ব্যাকুলতার স্রষ্টা। ডাক্তারবাবুদের কাছে এই নামটির একটি বিয়োগ ব্যথাতুর ব্যঞ্জনা আছে বলে জানি। সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে বলি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নামে একজন শ্রুতকীর্তি কবি তো ছিলেনই, একজন চিকিৎসকও ছিলেন। বিজ্ঞান সাধনায় তাঁর মতি ছিল। একুশ শতক তাঁকে টেস্টটিউব বেবির স্রষ্টার মর্যাদা দেয়। তাঁর সমকাল এই মর্যাদা দেওয়ায় কুণ্ঠিত ছিল। তাঁর স্বজাতির অস্বীকৃতি মর্মান্তিক হয়ে বেজেছিল তাঁর সংবেদনে। গভীর বিষন্নতা তাঁকে আত্মহননের পথে ঠেলে দিয়েছিল বলে জানা যায়।

তাঁর জীবন ও সাধনাকে আধার করে রমাপদ চৌধুরি একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। আটের দশকে সেটি অবলম্বন করে একটি ছায়াছবি তৈরি করেন তপন সিংহ। বাংলায় নয়, হিন্দিতে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে। ছবিটির নাম ‘এক ডক্টর কি মওত’। ছবির শেষ দৃশ্যে একটি বিমান রূপোলি পর্দায় ওপর দিয়ে আড়াআড়ি উড়ে গিয়েছিল। আর কালো পর্দার ওপর ইংরেজিতে একটি ঘোষণা ভেসে উঠেছিল যাকে হালফিলে আমরা ডিসক্লেইমার বলে থাকি। তা থেকে জানা গিয়েছিল, কয়েক বছর আগে একজন চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাকে আশ্রয় করে ছবিটি তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছিলেন।

এরপর আর দর্শকদের বুঝতে বাকি ছিল না যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ ছবির দীপঙ্কর রায়।

তপন সিংহ ডাক্তারবাবুদের নিয়ে আগেও ছায়াছবি বানিয়েছেন। ‘হসপিটাল’-এর কথা আমরা এই কলমে আলোচনা করেছি। ‘বাঞ্ছারামের বাগান’ ছবিটিতেও একজন ডাক্তারবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি আমরা। ‘এক ডক্টর কি মওত’-এর ডাক্তারবাবু এঁদের থেকে একটু আলাদা। তাঁর মধ্যে ট্র্যাজিক হিরোর

গুণ আছে। নরওয়েজিয়ান নাট্যকার নেরিক ইবসনের ‘অ্যান এনিমি অফ দ্য পিপল’ নিয়ে সত্যজিৎ রায় ‘গণশত্রু’ বানিয়েছিলেন। এর কয়েক বছর আগে বানানো ‘এক ডক্টর কি মওত’ ছবির কাঠামোতেও ওই নাটকের আদল পাই আমরা। তবে ফারাকও আছে বিস্তর। ইবসনের নাটকে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছিল। সদ্যজাত পুঁজিবাদী সমাজে নৈতিকতার স্খলনের ইঙ্গিত ছিল। এর বিরুদ্ধে একা কুম্ভের মতো লড়াই করে হেরে গিয়েছিলেন ডক্টর স্টকম্যান। ‘এক ডক্টর কি মওত’-এ এই পটভূমি নেই তা নয়। তবে নায়ক ডক্টর দীপঙ্কর রায়ের সংঘাত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নয়, তাঁর স্বজাতির সঙ্গে। বাঙালি কাঁকড়ার গল্প অনেকের জানা। নীরদচন্দ্র চৌধুরি ‘আত্মঘাতী বাঙালি’ এই শব্দবন্ধটিকে আমাদের মধ্যে চালু করে দিয়েছেন। ‘এক ডক্টর কি মওত’ ছবিতে একজন ডাক্তারবাবু নায়ক, খলনায়ক আরও অনেক ডাক্তারবাবু। খোলসা করে বলতে গেলে পুরো স্বাস্থ্য পরিকাঠামো।

এই অতি সংবেদনশীল বিষয়টিকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তপন সিংহ কিন্তু তা নয়। কতক মর‍্যালিটি-প্লে-র ধাঁচে গড়ে উঠেছে সওয়া দুঘন্টার এই ছবিটি। তপন সিংহের ছবিগুলির মধ্যে এটি ওপরের দিকে থাকে না, থাকার কোনো কারণও দেখি না। কিন্তু যে ছবিতে ডাক্তারবাবুদের কাঠগড়ায় তোলা হয় এবং যিনি তোলেন তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির একজন প্রিয় চলচ্চিত্রকার, তখন আমরা একটু তলিয়ে ভাবতে পারি।

‘এক ডক্টর কি মওত’ যে কলকাতার কথা বলে সে কলকাতার নগরপালের নাম বিকাশকলি বসু। সে কলকাতায় টেলিগ্রাফ-টাইমস অফ ইন্ডিয়া নয়, মর্নিং টি-তে চুমুক দিয়ে স্টেটসম্যান-অমৃত বাজারের পাতা ওল্টায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। এই কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চাকরি করেন দীপঙ্কর রায় (পঙ্কজ কাপুর)। সকাল সকাল ওয়ার্ড ডিউটি দেন। ভাড়া বাড়িতে ফিরেই সোজা ঢুকে পড়েন এক চিলতে ল্যাবরেটরিতে। সেখানে খাঁচায় ভরা আছে অনেক গিনিপিগ। একটি রেশাস মাংকি। গবেষণা চলে। পরীক্ষা চলে। সব রকম ভাবে তাঁকে সাহায্য করে চলেন তাঁর স্ত্রী সীমা (শাবানা আজমি)। এমন কাজপাগল আপনভোলা মানুষকে নিয়ে সংসার করা যায় নাকি? যাঁর দিনরাতের কোনো ঠিক নেই, টেস্ট টিউব-বার্নার নিয়ে যাঁর বেলা বয়ে যায়, তাঁকে আর ভালোবাসা যায়? এই হতাশা অনেকবার ব্যথিত করেছে সীমাকে। ভেবেছেন ইস্কুল-কলেজে চাকরি নেবেন। নিজের মতো থাকবেন। যেতে পারেননি।

দীপঙ্করকে আদর্শ ডাক্তারবাবু বলা মুশকিল। কাজে ফাঁকি দেন এমন নয়। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে ওয়ার্ড ডিউটি তাঁর কাছে স্রেফ সময় নষ্ট। তাঁর মন পড়ে থাকে তাঁর নিজের ল্যাবরেটরিতে। তাঁকে ছুটোছুটি করতে হয় অন্যান্য ল্যাবরেটরিতে।

এভাবে দশ বছর কেটে যায়।

একদিন অমৃতবাজারের প্রথম পাতায় একটি বিস্ফোরক খবর বেরোয়। দীপঙ্কর দাবি করেছেন

তিনি কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল হয়ে যাবে কুষ্ঠরোগ। গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে এই টিকা দেওয়া হলে সন্তানের কুষ্ঠ হবে না। বন্ধ্যাত্ব কাটাতেও সহায়ক হতে পারে এই টিকা।

দেশে বিদেশে সাড়া পড়ে যায়। বি বি সি অবধি খবর পৌঁছয়। কিন্তু ডাক্তারবাবুদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হয় অদ্ভুত। মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডা. কুন্ডুর (অনিল চট্টোপাধ্যায়) মতো কয়েকজন ছাড়া কলকাতার নামি ডাক্তারবাবুদের অনেকেই এই দাবিকে ধাপ্পাবাজি বলে উড়িয়ে দেন। প্রকাশ্য বিবৃতি দেন ডাকসাইটে দুজন গাইনোকলজিস্ট। ইস্কুল থেকে কলেজ অবধি দীপঙ্করের সহপাঠী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারবাবু অরিজিৎ (বিজয়েন্দ্র ঘাটগে) পরোক্ষে তাঁদের সহযোগিতা করে চলেন। স্বাস্থ্য দপ্তর নড়ে চড়ে বসে। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডেকে পাঠান দীপঙ্করকে। রগচটা দীপঙ্কর তাঁকে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে আরও বিরাগভাজন হন। মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্র তাঁর কথা শুনবার অছিলায় তাঁকে প্রকাশ্যে অপমান করে। তিতিবিরক্ত দীপঙ্কর বুঝে পান না কেন ডাক্তারবাবুরা তাঁর পিছনে পড়ে গিয়েছেন? এ আবিষ্কারের কূটকচালি নিয়ে তো মাইক্রোবায়োলজিস্ট, সেলুলার বায়োলজিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্টদের মাথা ঘামানোর কথা। বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণের কথাই তো খালি বলেছেন। সে তো এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। টক্সিসিটি ফ্যাক্টর নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। মানবদেহে কোনো পরীক্ষা এখনও হয়নি! তবে কেন তাঁর মাথার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন উপার্জনশীল ডাক্তারবাবুর দল? তাঁর মতো বিজ্ঞানসেবককে জব্দ করার জন্য বিতিকিচ্ছিরি ঘোঁট পাকাচ্ছেন কেন?

হতাশ হয়ে আমেরিকা চলে যেতে চান দীপঙ্কর। অতদূর যেতে হয় না। রাজ্য সরকার তাঁকে পাঠিয়ে দেন এক গ্রামীণ হাসপাতালে। চাকরি বড়ো দায়। অগত্যা কাতারে কাতারে রোগী দেখার পর রাতের পর রাত জেগে রিসার্চ পেপার তৈরির চেষ্টায় লেগে থাকেন দীপঙ্কর। পেরে ওঠেন না। স্বাস্থ্য দপ্তরে লন্ডনের জন অ্যান্ডারসন ফাউন্ডেশনের চিঠি আসে। দীপঙ্করকে তাঁরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন লন্ডনে গিয়ে গবেষণার দলিল পেশ করতে। অধিকর্তা সেটিকে চেপে দেন। বন্ধু অরিজিতের হস্তক্ষেপে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা

হয় দীপঙ্করকে। ইতিমধ্যে খবর আসে বিদেশের দুই বৈজ্ঞানিক কুষ্ঠরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

ভেঙেই পড়েছিলেন। জন অ্যান্ডারসন ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণে এক বহুজাতিক সংস্থার ব্যয়ভারে গবেষণা প্রকল্পে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ তাঁকে বাঁচিয়ে দেয়। বিমান উড়ে যায় পশ্চিম দিগন্তে।

অতিনাটকীয় নির্মাণ। নায়ক-প্রতিনায়ক খাড়া করার অদম্য আগ্রহ। এ দুটি 'এক ডক্টর কি মওত'-এর মন্দ দিক। বাঙালি চরিত্র তির্যক মন্তব্য করার জন্য আর মতলবি তথা রইস ডাক্তারবাবুদের কাছা খুলে দেবার জন্য তপন সিংহ 'এক ডক্টর কি মওত' বানিয়েছেন আর কাজটি মসৃণ করতে মৌলিক গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ একজন চিকিৎসককে সামনে এনেছেন, এমন উপসংহার টানাই যেতে পারে।

আমরা এর মধ্যে থেকে কয়েকটি প্রবণতাকে খুঁজে নিতে চাইব।

প্রবণতা এক। এ দেশ থেকে মৌলিক গবেষণার কাজ বড়ো শক্ত ঠাঁই। আর সরকারি চাকুরে হলে তা অসম্ভব। এত লাল ফিতের ফাঁস, পদে পদে এত নজরদারি, এত হিংসুটেপনা আর মধ্যমেধার মৌরুসি পাট্টাকে ছাপিয়ে গিয়ে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা যায় না।

প্রবণতা দুই। ডাক্তারবাবুদের মতো কুচুটে জাত কমই আছে। ডাক্তারির ছাত্র? তারা এক কাঠি সরেস। একজন গবেষককে উৎসাহ দেওয়া, তাঁর আবিষ্কারকে জানতে চাওয়া দূরে থাক, তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করাটাই সিংহভাগ ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্য। তাঁরা নিজেরা কুষ্ঠরোগ আর রোগীকে ঘৃণা করবেন, আর তাঁদের স্বজাতির কেউ এ নিয়ে কাজ করছেন শুনলে হাঁড়িকাঠ সাজাতে থাকবেন। স্বাস্থ্য আধিকারিক একজন ডাক্তার হওয়ায় গবেষককে কোণঠাসা করতে তাঁদের কোনো বেগ পেতে হবে না।

প্রবণতা তিন। বেয়াড়া বেয়াদব ডাক্তারবাবুকে টিট করার সহজ পাঠ পড়েছেন সরকারি আধিকারিকরা। পানিশমেন্ট পোস্টিং। এমন জায়গায় পাঠিয়ে দাও যেখানে গবেষণার ন্যূনতম অবকাশ পাওয়া যাবে না, পরিকাঠামো কা কথা! এ ধরনের ঘটনা আজকাল এই ২০১২ সালেও আকছার ঘটছে বলে কানে আসছে। অতএব সাধু সাবধান!

প্রবণতা চার। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের সম্পর্ক যত শিথিল হয় তত মঙ্গল। আবিষ্কারের খবরটি সাত তাড়াতাড়ি কাগজে না বেরোলে এত অনর্থ হত না।

প্রবণতা পাঁচ। বিজ্ঞানসাধকের স্ত্রী হওয়া মানেই বঞ্চনা আর নিঃসঙ্গতার অন্ধকূপে ঢুকে পড়া। সেই অন্ধকূপে কোনো প্রত্যাশা নেই, কোনো সংবেদনশীলতা নেই। কেবল নিঃস্বার্থ সেবা আছে। আর হ্যাঁ, স্বপ্নও আছে। 'এক ডক্টর কি মওত'-এ দুটি ইতিবাচক চরিত্রের একটি দীপঙ্করপত্নী সীমা, তিনি বলে চলেন, 'বদলেগা, সব বদলেগা একদিন।'

প্রবণতা ছয়। বিজ্ঞানগবেষক তবে যাবেন কোথায়? তপন সিংহের উত্তর বিদেশ যাবেন। বিলেত-আমেরিকায় যাবেন। ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে সাহেবসুবোদের আগ্রহ এত বেশি যে যোগ্য গবেষকের সন্ধান পেলে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের গন্ডগ্রামে গিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করতে পারবেন, তাঁকে নিজেদের দেশে নিয়ে যাবার তোড়জোড় করতে পারেন। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। কতক নীতিবাগীশের জায়গা থেকে 'এক ডক্টর কি মওত' তৈরি হওয়ায় সহজেই এমন ফর্দ বানিয়ে ফেলা যায়।

বানাতে বানাতে মন খারাপও হয়। জনমানসে ডাক্তারবাবুদের অবয়ব কি এতই ক্লেদময় যে আজ থেকে সিকি শতক আগেই এমন ছবি বানাতে পারলেন তপন সিংহ? দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত এই চলচ্চিত্রকার আর্ট সিনেমা আর কমার্শিয়াল সিনেমার মাঝখান দিয়ে চলেছেন বলে আমাদের কপালের ভাঁজ আরো গভীর হয়।

অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

লেখক পরিচিতিঃ অংশুমান ভৌমিক— শিক্ষক, সাংবাদিক ও শিল্প-সমালোচক।

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু,

ডা. অসীম চ্যাটার্জির লেখা 'স্বাস্থ্যখাতে খরচ' পড়ে ভাল লাগল। মনে হচ্ছিল এই রকমই একটা লেখা চাইছিলাম। **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র মূল লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই হয়তো এই লেখা। চিকিৎসক গোষ্ঠির (তা যে দেশেরই হোক না কেন) গাইডলাইনগুলো চিকিৎসক ও রোগীর উভয়েরই অবগত থাকা অত্যন্ত জরুরি। এটাই হয়তো ক্রমবর্ধমান চিকিৎসার ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত রাখার একটা গুরুত্বপূর্ণ পথ। পাশাপাশি চিকিৎসাকে মুনাফার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে এটা কিছুটা সাহায্য করবে। সোজা কথায় জানুন, প্রশ্ন করুন, স্বাস্থ্যসেবার তথাকথিত কান্ডারীদের ' 'blank cheque' দেওয়া বন্ধ করুন।

এটাও সত্য যে এগুলি গাইডলাইন মাত্র, শেষ কথা নয়। ছ'সপ্তাহের আগে যদি কেউ কোমরের আঘাতজনিত ব্যথা নিয়ে আসে এবং ডাক্তার মেরুদন্ডের হাড়ে চোট আছে মনে করেন তাহলেও কি কোমরের X-ray করা যাবে না? বিশেষজ্ঞরা মতামত দেবেন। সাইনাসের প্রদাহে শুরুতে কখনোই antibiotic নয়— এ ক্ষেত্রেও বলি অবশ্যই জানা দরকার ডাক্তার কেন দিতে চাইছেন। TMT, Echocardiogram বা Coronary Angioplasty সম্বন্ধে বলি— বিশাল ব্যয়বহুল হাসপাতালগুলির খরচ তুলে নেওয়ার স্বার্থে, বুকের হাড়ের রোগে (Costochondritis) বা Gastro-Eesophageal Reflux Disease (পেটের খাবারের অংশ খাদ্যনালীতে চলে আসাতে)-এও অবলীলাক্রমে Angiogram হয়ে যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত আছে তাই এটা সত্য যে হার্টের অসুখ নেই, বা হার্টের অসুখের কোনো ঝুঁকিও নেই (যেমন উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ বা লিপিডজনিত গোলমাল) সেক্ষেত্রে TMT, Ecocardiogram বা Coronary Angiogram করা মানে নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে চিকিৎসা বাণিজ্যের মুনাফা বাড়ানো।

বিশাল ব্যয়বহুল হাসপাতালগুলির খরচ তুলে নেওয়ার স্বার্থে, বুকের হাড়ের রোগে বা রিফ্লাক্স (পেটের খাবারের অংশ খাদ্যনালীতে চলে আসাতে)-এও অবলীলাক্রমে অ্যাঞ্জিওগ্রাম হয়ে যাচ্ছে। ... হার্টের অসুখ নেই, বা হার্টের অসুখের কোনো ঝুঁকিও নেই (যেমন উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ বা লিপিডজনিত গোলমাল) সেক্ষেত্রে টি এম টি, ইকোকার্ডিওগ্রাম বা করোনারী অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা মানে নিজের স্বাস্থ্যের বিনিময়ে চিকিৎসা বাণিজ্যের মুনাফা বাড়ানো।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। চিকিৎসক ও রোগীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক চিকিৎসার সাফল্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ, খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই এ সম্পর্ককে মাথায় রেখেই ডাক্তারের কাছে জানুন ও প্রশ্ন করুন। সম্পাদকের বক্তব্য ঠিকই যে বিজ্ঞানমনস্ক চিকিৎসক অধৈর্য হন না— শিক্ষার জন্য তৈরি থাকেন।

পরিশেষে লেখকের কাছে ও **স্বাস্থ্যের বৃত্তে**-র পরিচালক মন্ডলীর কাছে অনুরোধ আরও এই ধরনের গাইডলাইন প্রকাশ করুন।

— ধন্যবাদান্তে
ডা. তুহীন রায়
কাতরাস, ঝাড়খন্ড

* * *

প্রতি
প্রিয় সম্পাদক,

স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর ২০১২ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশুমান ভৌমিকের চলচ্চিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে এই পত্র। জনপ্রিয় সিনেমায় চিকিৎসা ও চিকিৎসকের উপস্থাপনার বিশ্লেষণ নিয়মিত প্রকাশ করার এই সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তটি ভাল, আর সে সিদ্ধান্তের রূপায়ণের পক্ষে সমালোচকের কলমটিও অতি জুতসই। শুধু কলম নয় অবশ্য। লেখকের মজবুত বৈজ্ঞানিক অবস্থান ও অভিনব দৃষ্টিকোণও প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া, যেভাবে তিনি তাঁর সমালোচনা কর্মটিকে চমকপ্রদ ভাবে শুরু করে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়ে আবার ক্লাইমেক্সে গুটিয়ে এনেছেন, সেও প্রায় এক সিনেমাই। এসব পড়ে আরও কিছু কথা মনের মধ্যে জাগছে, যেগুলো পত্রিকার পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে ভাল লাগবে।

তবে তা করার আগে বলিউড সিনেমার ব্যাপারে আমার জ্ঞানের বহরটা একটু বলা দরকার। বেশি না, দু-দশ লাইনে। পাবলিক পত্রে এই ভাবে প্রাইভেট ম্যাটার টেনে আনাটা পাঠক ক্ষমা করে দেবেন বলে যে আমার দুরন্ত আশাবাদ, সেটা ওই বাকসংযমের কারণে। বলিউড সিনেমায় একই টিকিটে একই দামে নাচা-গানা ফ্রি দেবার একটা রীতি আছে, ওইটের প্রতি আমার তীব্র অব্যক্ত আতঙ্কের কারণে গত বছর পঁচিশেক হিন্দি ছবি দেখিনি (মাঝে মাঝে ভাবি মনোচিকিৎসক মাননীয় সুমিত দাশকে একবার দেখিয়ে নিলে কেমন হয়)। সম্প্রতি অবশ্য *'কহানি'* আর *'চিটাগাং'* দেখেছি, বিশ্বস্তসূত্রে এই আশ্বাস পেয়ে যে ওদুটোতে ও উপদ্রব নেই। এখন এসবের মধ্যে দিয়ে যে কেলেঙ্কারিটা হয়ে গেছে সেটা এই যে, শ্রী ভৌমিকের চমৎকার লেখাটির প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মনে পড়ল, আরে যাঃ, তালেগোলে *'আনন্দ'* সিনেমাটাই তো দেখে ওঠা হয়নি! জনৈক সিনেমাপ্রেমী বন্ধু অবশ্য অচিরে সে ব্যবস্থা করে দিলেন, অতঃপর এই পত্র।

বেশির ভাগ সিনেমা দর্শকের কাছে পাষন্ড বলে চিহ্নিত হবার ঝুঁকি নিয়েই বলি, আমার মত লোকের পক্ষে এই ধরনের সিনেমা বসে বসে দুঘন্টা ধরে দেখা বেশ কঠিন। কালান্তক রোগের শারীরিক কষ্টটুকু শেষ দৃশ্যের ক্লাইম্যাক্সের জন্য রেখে দিয়ে এক শেষ পর্যায়ের অন্ত্র-কর্কট রোগীর গোটা সিনেমা জুড়ে শারীরিক দাপাদাপি, অতিনাটকীয় বাচালতা, অনতি-উচ্চমানের রসিকতা আর কাঁচা দার্শনিকতা, প্রায় সবকটি প্রধান চরিত্রে ভক্তিরসের প্রাবল্য... এক কথায় অমিতাভ বচ্চনের সংযত অভিনয় ছাড়া বাকি প্রায় সবটাই দেখতে দেখতে রীতিমত চোখ ব্যথা করে। আর তার সাথে সাথে জেগে ওঠে এক অত্যাশ্চর্য মাথাব্যথাও। যে ছবি বসে দেখতে পারি না, তা এত মানুষকে আনন্দ দিয়েছে কোন প্রক্রিয়ায়? গণমানুষের যৌথ রুচি ও মেধা সম্পর্কে অশ্রদ্ধা পোষণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আরও অসম্ভব পরিচালককে নির্বোধ ভাবা। তাহলে বাকি থাকে একটিই রাস্তা— মানুষের যৌথ হৃদয়তন্ত্রীটি হাতড়ে বেড়ানো, হয়ত বা আমি এখনও যার নাগাল পাইনি।

একটু অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা করা যেতে পারে কি? অন্তিম পর্যায়ের কর্কট রোগীর দুঘন্টা ব্যাপী (মানে কয়েক মাসের) দাপাদাপি অবাস্তব বটে, কিন্তু শিল্পের তো সবসময় বাস্তবের হাত ধরে চলার দায় থাকে না, এমনকি মহৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। ভুল বুঝবেন না, আমি কিন্তু মোটেই বাস্তবের সাথে শিল্পের সম্পর্কচ্ছেদের কথা বলছি না। শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে বাস্তবতার কোনো বিশেষ দিক বা সে সম্পর্কে কোনো অভিনব উপলব্ধিকে 'আন্ডারলাইন' করার জন্য বা 'কমিউনিকেশন'-এর স্বার্থে শিল্পী হয়তো কখনও বাস্তবতাকে উপস্থাপিত করবার প্রচলিত ও স্বাভাবিক রীতি-নীতিকে ভাঙচুর করতে চাইতেও পারেন। সেই জন্য কবি মুখের কথাকে ভেঙে কবিতা লেখেন, চিত্র শিল্পী যুদ্ধের বীভৎসতা বোঝাবার জন্য মানবশরীরে ভাঙচুর করেন, আর ঔপন্যাসিক বা গল্পকার আমদানি করেন জাদু-বাস্তবতা। আচ্ছা, তাহলে এমনটা কি হতে পারে যে, এইসব অবাস্তব ও অবৌদ্ধিকতার মধ্যে দিয়ে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় কিছু একটা আন্ডারলাইন করতে চেয়েছেন, ইন্ডিকেট করতে চেয়েছেন। যদি তাই হয় তো তবে সেটা কি? সমালোচক শ্রী ভৌমিক একভাবে সে প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েছেন— 'মোহন-মাধ্যম' এর প্রতাপ! যা কিনা ''আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে উপরওয়ালার মর্জির কাছে তার অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিষ্ঠিত করে, পপুলার কালচারের হাঁড়িকাঠে ডাক্তারের ভাবমূর্তি বলি দিয়ে আমাদের অজান্তেই তৈরি করে এক 'ক্লীব চিকিৎসকের স্টিরিওটাইপ'। কথাটা ঠিক, এবং লেখক এখানেই শেষ করেছেন। কিন্তু কথাটা তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছল কি? আমার মনে হয়, এটা আসলে হওয়া উচিত অনুসন্ধানের শুরু। গণমাধ্যম যে তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও স্থিতাবস্থার পক্ষে উপযোগী মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, এটা বোঝা সহজ। কিন্তু চিকিৎসা-সংকট ও ভ্রষ্টাচারে জর্জরিত মানুষ তাঁর গাঁটের কড়ি খরচা করে তা দেখে কেন, দেখতে দেখতে চোখের জল ফেলে কেন, আর মৃত নায়কের নামে সমবেত জয়ধ্বনিই বা দেয় কেন? কী দায় পড়েছে তাঁর? সিনেমা না দেখে ঘরে বসে থাকলে মিডিয়া মামলাও করে না, বাড়িতে পুলিশও পাঠায় না। তাহলে কী সেই শক্তি যা মোহন-মাধ্যমকে 'মোহন' করে তোলে? এটাই হয়তো প্রশ্নের ভেতরের প্রশ্ন। আমি সমাজবিদ নই, গণসংযোগ বিশেষজ্ঞও নই। তবু সাহস করে কয়েকটা কথা বলি। সমালোচক জানেন, জনস্বাস্থ্যের যে করুণ চিত্র এ ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে, অন্তত প্রথম দিকটায়, তা কঠোর বাস্তব— তা তাঁর 'কপালে ভাঁজ' ফেলে। রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতা, গড়পড়তা চিকিৎসকের প্র্যাগমাটিজম, ব্যতিক্রমী বিবেকী চিকিৎসকের অসহায়তা ও বিভ্রান্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা— এর কোনোটাই অবাস্তব নয়। কিন্তু পরিচালক এ বাস্তবতাকে অপারেশন টেবিলে তুলে তার ক্ষত-পূঁজ-রক্ত উন্মোচিত করেন না। তিনি কাউকেই কাঠগড়ায় তোলেন না, কাউকেই ক্রুদ্ধ হতে দেন না। তাঁর নায়ক নিজের মারণ রোগ নিয়ে মোটে মাথাই ঘামায় না, নিজের জীবনের একান্ত দুঃখের কথাও কাউকে বলতে চায় না, শুধু ইয়ার্কি-ফাজলামো দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখতে চায়। সে বিশ্বাস করে, জীবন-মৃত্যু নিয়ে শেষ পর্যন্ত কারুর কিছু করার নেই, সবই ওপরওয়ালার হাত। হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়। নায়কের অন্তিম দৃশ্যে হঠাৎ রেকর্ডারে বেজে ওঠা এইসব কথাগুলো তাঁর প্রিয় চিকিৎসকদের দুঃখিত করে, কিন্তু একই সঙ্গে জনস্বাস্থ্য-সংকটের নৈতিক দায় থেকে তাঁদের মুক্তও করে দেয়। আর চিকিৎসা-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ তার মধ্যে খুঁজে পান ব্যক্তিগত জীবনপিপাসা দিয়ে মৃত্যুকে জয় করবার এক ভুয়ো আশ্বাস। এ সিনেমা তাঁকে সত্যিকারের চিকিৎসা পাবার (বা না পাবার) যুক্তিসঙ্গত কারণ খোঁজার কষ্টকর দায় থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যায় এক আধ্যাত্মিকতা-মন্ডিত 'অলটারনেটিভ অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন'-এর দিকে। তার মধ্যে হোমিওপ্যাথি, শেকড়-বাকড় আর বাবাজির আশীর্বাদও আছে, তবে আসল দার্শনিক নির্যাসটি ঃ বাস্তব দুঃখকষ্টের মোকাবিলা কর আত্মিক শক্তি দিয়ে। এও এক রকমের জীবনের জয়গান— কোনো এক নেতিবাচক করুণ অর্থে। চিকিৎসা-ক্লিষ্ট নিরুপায় সাধারণ দর্শক তাই বড় দ্রুত নিজেকে আইডেন্টিফাই করেন নায়কের সাথে, দুঃখের বন্যায় খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে নিজের ভেতরে হাতড়াতে থাকেন 'আনন্দ'-কে। তাঁর বাস্তব দুঃখ বদলে যায় দুঃখ-বিলাসে, আর নিষ্ফল ক্রোধের সম্ভাবনা বদলে যায় দার্শনিক দীর্ঘশ্বাসে। ওদিকে ওপরওয়ালার বাঁ হাতের খেল তাঁর অশ্রুসাগরের ছলাৎকারকে পরিণত করে টাকার ঠনাৎকারে। লাল হয়ে ওঠে বলিউড, আমাদের ডাক্তারি ব্যবস্থাকে বিন্দুমাত্র বিব্রত না করেই।

চিকিৎসা-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ রাজেশ খান্নার মধ্যে খুঁজে পান ব্যক্তিগত জীবনপিপাসা দিয়ে মৃত্যুকে জয় করবার এক ভুয়ো আশ্বাস। এ সিনেমা তাঁকে সত্যিকারের চিকিৎসা পাবার (বা না পাবার) যুক্তিসঙ্গত কারণ খোঁজার কষ্টকর দায় থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ে যায় এক আধ্যাত্মিকতা-মন্ডিত 'অলটারনেটিভ অ্যান্ড কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন'-এর দিকে।

সমালোচক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ডাক্তার-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে চলে যাওয়া এই দুঘন্টা দুমিনিটের মেলোড্রামা-টির বিরুদ্ধে ডাক্তাররা কোনো প্রতিবাদ করেননি। লেকিন, ওহলোগ অ্যায়সা করেঙ্গে কিঁউ বাবুমশাই?

এখানেই বোধহয় কথা শেষ করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আরও কয়েকটা কথা মনে পড়ছে। ১৯৭৮ সালে আলমা আটায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সভায় ঘোষিত হয় দুহাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের অঙ্গীকার, আর নয়ের দশকের মধ্যেই তার প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। ওদিকে সরকারও জনস্বাস্থ্যের দায়িত্ব থেকে ক্রমশ পিছিয়ে আসতে থাকে। একদিকে ফেঁপে ওঠে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার বাজার, আর তার ফাঁকফোঁকর ভরাতে শুরু হয়ে যায় অবৈজ্ঞানিক মরমিয়াবাদী আরোগ্যের ফলাও ব্যবসা। অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে দায়িত্বশীল সংস্থাগুলোর সরাসরি প্রশ্রয়ে। তাই ১৯৭১-এর এই সফল সিনেমাটির দিকে যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন সন্দেহ থাকে না যে পরিচালক (গল্পটিও তাঁরই) হৃশীকেশ মুখোপাধ্যায় এক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা পুরুষ ছিলেন। কিন্তু আমরা?

— ধন্যবাদান্তে,
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক,
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

* * *

প্রতি
প্রিয় সম্পাদক,

আমি আপনার প্রকাশিত **স্বাস্থ্যের বৃত্তে** প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১২) এবং চতুর্থ সংখ্যা (এপ্রিল-মে ২০১২) পত্রিকা দুটি পড়লাম। আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যবহুল প্রবন্ধগুলি

থেকে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে কোনটা চিকিৎসাবিজ্ঞান ও কোনটা চিকিৎসা-বাণিজ্য এবং কোনটা জনদরদী স্বাস্থ্যনীতি ও কোনটা কৌশলী রাজনীতি— বিষয়গুলির স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

কিন্তু 'জিন পরিবর্তিত খাদ্যের কথা' নিয়ে লেখা ড. শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হিতে বিপরীত এই কারণেই বলছি, ওঁর প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় উনি জিন পরিবর্তিত শস্যের বিরুদ্ধেই লিখতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রবন্ধে যে মারাত্মক ভুলগুলি রয়েছে সেগুলি কোট করে কর্পোরেট ভাড়াটে বিজ্ঞানীরা দাবি রাখতেই পারেন যে, যাঁরা জিন পরিবর্তিত শস্যের বিরোধিতা করছেন তাঁরা আসলে বিজ্ঞানটাই বোঝেন না। তাঁরা বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সমাজের অগ্রগতি চান না। তখন আন্দোলনকারীদের কিছু বলার থাকে না। তাই অধ্যাপক মহাশয়ের প্রবন্ধটি লেখার পূর্বে ছাত্র-সুলভ মনোভাব নিয়ে জিন পরিবর্তিত শস্য সংক্রান্ত বিজ্ঞানের পাঠ নেওয়া উচিত ছিল।

''একটি বীজের সঙ্গে অন্য একটি বীজ বা একটি ফুলের সঙ্গে অন্য জাতের ফুলের পরাগ রেণু দিয়ে নিষিক্ত করার পদ্ধতি''— ভিন্ন জাতের ফুলের সঙ্গে ফুলের পরাগ মিলনের ফলে নিষিক্তকরণটা বোঝা গেল। কিন্তু বীজের সঙ্গে বীজের ব্যাপারটা বোঝা গেল না। কারণ ওটা বাস্তবে হয়না।

''কৃষকদের নির্মিত এই জৈব প্রযুক্তিতে একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রজাতির মধ্যে মিলন ঘটিয়ে''— জীবন বিজ্ঞানের অ আ ক খ যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এটার ব্যাখ্যার প্রয়োজন— একই জাতের ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যসম্পন্ন প্রজাতি নাকি একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জাত?

''কিছু কিছু রোগ নিরোধক জিন যা বিটি জিন নামে এখন পরিচিত হয়ে উঠেছে, সেটিকে প্রাকৃতিকভাবে লভ্য তুলোর জিন সমষ্টিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের অনুমান যে অণুজীবের জিন সমষ্টিতে অবস্থান করে এই জিনটি যেহেতু কিছু কিছু রোগ-নিরোধক প্রবণতা দেখায়, তুলোর জিন সমষ্টিতে অবস্থান করেও এই জিনটি তখন তুলোকে ঐ সমস্ত রোগের বিরুদ্ধে আপনা থেকেই প্রতিরোধী করে তুলবে''। — ''কিছু কিছু রোগ-নিরোধক জিন বা বিটি জিন''— কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটি আদৌ রোগ-নিরোধক জিন নয়। বিটি শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হল ব্যাসিলাস থরিঙ্গিয়েনসিস। এটি মাটিতে বসবাসকারী একটি জীবাণু। এই জীবাণু বিশেষ বর্গের পতঙ্গকে আক্রমণ করে। বিটি জিনের সংকেতের সাহায্যে যে প্রোটিন ঐ জীবাণু উৎপন্ন করে তার বিষক্রিয়ায় ঐ পতঙ্গ মারা যায়। ঐ বিশেষ জিন বা বংশাণুটি তুলো গাছের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে তুলো গাছ নিজের শরীরে কীটঘ্ন বিষ উৎপন্ন করতে পারে। তাই ''বিটি জিন'' গাছকে ''রোগের বিরুদ্ধে আপনা থেকেই প্রতিরোধী করে তুলবে'' না। বিটি তুলো গাছের কান্ড বা পাতার রস খেলে তুলো গাছের শত্রু পোকারা মারা পড়বে— যে বিজ্ঞানীরা এই বিটি তুলো গাছ তৈরি করেছেন তাঁরা এমনটাই দাবী করেন। ইস্কুলের শিক্ষা থেকেই আমরা জেনেছি ব্যাকটেরিয়াকে প্রাণী বলা চলে না ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুকে সম্পূর্ণ আলাদা গোষ্ঠীর জীব হিসেবে ধরা হয়।

''উৎপাদনও আস্তে আস্তে কমে আসে। এমনকি প্রাকৃতিক তুলোর প্রকৃতিগত যে নিজস্ব রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল, এই বেতালা নৃত্যের পাল্লায় পড়ে সেটাও নষ্ট হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে তুলোর বীজ মরে যায়, কেউ কেউ আবার বাঁজা হয়ে যায়।'' ''— রোগাক্রান্ত উদ্ভিদের বীজ বাঁজা হয়ে যাওয়া''--- কথাটির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?

অধ্যাপক মহাশয় অজ্ঞানতা বশত বিটি শস্য এবং টার্মিনেটর প্রযুক্তি গুলিয়ে ফেলেছেন। বাণিজ্যিক কারণে প্রযুক্তিগত কৌশলে টার্মিনেটর সীড বা বাঁজা বীজ তৈরি করা হয়। রোগাক্রান্ত হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বীজ বাঁজা হয়ে যায় না। বাঁজা বীজ তৈরিতে বিটি জিনের কোনো অবদান নেই।

''বিশেষ জাতের কীটনাশক লাগে ঐ পরক জিনটিকে সক্রিয় করতে। উদাহরণ হিসেবে আমরা মনস্যান্টো সংস্থার রাউন্ড-আপরেডি কীটনাশকের কথা বলতে পারি, যা বিক্রি করা জৈব প্রযুক্তিজাত বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটি পরক জিনকে সক্রিয় করতে প্রয়োজন হয়।'' প্রথমত, ''রাউন্ড-আপরেডি'' কোনো কীটনাশক নয়। এটি একটি জিন পরিবর্তিত শস্য বা শস্যের বীজ। মনস্যান্টো কোম্পানির তৈরি রাউন্ড-আপ নামক আগাছানাশক প্রয়োগ করা জমিতেও এই বীজ অঙ্কুরিত হতে সক্ষম এবং বেড়ে উঠতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, পরক জিন বলতে উনি যাই বোঝাতে চান, কোনো জিনকে সক্রিয় করতে রাউন্ড-আপের কোনো ভূমিকা নেই। রাউন্ড-আপের আলোচনা এখানে বিসমিল্লায় গলদ।

''ভারতের বাসমতী চালের সুগন্ধের জন্য দায়ী সুগন্ধ জিনটিকে হঠিয়ে দিয়ে মার্কিন দেশ বানিয়েছিল ট্যাক্সমতী— বাসমতীর সুগন্ধ সাহেবরা সইতে পারতো না বলে।'' কথাটি ট্যাক্সমতী নয় টেক্সমতী। রাইসটেক ইনকর্পোরেটে টেক্সমতী বা যশমতী নামে যে চাল বাজারে বিক্রি করে তার পেটেন্ট নং ৫৬৬৩৪৮১ (১৯৯৭)— এটি জিন পরিবর্তিত শস্য নয়। জিন কেটে বাদ দেওয়াটা ওঁনার কষ্ট কল্পনা এবং পাঠক ঠকানো তথ্য। দেশে-বিদেশে বাসমতীর সুঘ্রাণের জন্যই খ্যাতি। তাই প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টন বাসমতী চাল ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে ভারত থেকে রপ্তানি করা হয়। বাসমতীর বাৎসরিক রপ্তানির পরিমাণ (১৯৯৬-৯৭) চার লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টন। এর চাহিদা ক্রম বর্ধিষ্ণু। বাসমতীর সুগন্ধ সাহেবদের অসহ্য, একথা শুনলে সাহেবরাও চমকে যাবে।

''...জিন সংস্থাপন করা সম্ভব এবং তা সংস্থাপিত ফসলের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না।'' মৌলিক পরিবর্তন বলতে উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? প্রতিটি কোষে কোষে বিষ উৎপন্ন হওয়াকে কি মৌলিক পরিবর্তন বলা যায় না?

বিটি শস্য, টার্মিনেটর শস্য, ভার্মিনেটর শস্য, রাউন্ড-আপরেডি, রাউন্ডআপ, বাসমতীর পেটেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল থাকলে উৎস মানুষ প্রকাশনের ড. দেবল দেবের লেখা ''লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি,'' ফোরাম ফর বায়োটেকনলজি অ্যান্ড ফুড সিকিউরিটির ''বিটি তুলো ঃ মরণ ফাঁদ,'' এবং রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স, টেকনলজি অ্যান্ড ইকোলজির ''বাসমতী বীজ ডাকাতি'' বইগুলি পড়তে পারেন। প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বিষয়গুলির প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উনি পেয়ে যাবেন। লেখক জীব-পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক, অথচ জীববিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যগুলো তিনি জানেন না, এটা জেনে খুব অবাক হলাম। এরকম লেখা আরো প্রকাশিত হলে বিজ্ঞান আন্দোলনের সর্বনাশ, অপবিজ্ঞানের পৌষমাস।

—ভৈরব সাইনি
পাঁচাল, বাঁকুড়া।

লেখকের উত্তর ঃ শ্রী ভৈরব সাইনি মহাশয়কে ধন্যবাদ, তিনি আমার লেখা অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধটি পড়ে অনেক মন্তব্য করেছেন। প্রথমেই বলে নিই যে আমার লেখা পড়ে লেখাটি যে জিন পরিবর্তিত খাদ্য-র বিরুদ্ধে এমন ধারণা গড়ে উঠেছে, তাতেই আমি খুশি, কেননা মোটামুটি এই বিষয়টি বলার জন্যই এই বিষয়ে আমার সামান্য ধারণা প্রচার করতে চেয়েছিলাম। আর পত্রলেখকের আশঙ্কা যে আমার ভুলে ভর্তি, বিশেষত বৈজ্ঞানিক তথ্য, ব্যাখ্যার ভ্রান্তির জন্য জৈব-প্রযুক্তির কোম্পানিগুলো সেগুলো দেখিয়ে পত্রলেখকদের দীর্ঘ আন্দোলনকে নস্যাৎ করবে, এমনটা বোধহয় ঘটবে না। অন্তত এমনটা ঘটার লক্ষণ এখনও স্পষ্ট নয়। যেখানে মান্য বিজ্ঞানের গবেষণাপত্র-র ব্যাখ্যা, পরীক্ষা এবং তথ্যকে কোম্পানিরা মান্যতা দেয়না, যেখানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের যুক্তি এবং পরীক্ষাকে উড়িয়ে দেয়, সেখানে ভুলে ভর্তি ভ্রান্ত ধারণায় পরিপূর্ণ লেখাকে তারা আদৌ পাত্তা দেবে না। বরং যদি জনশিক্ষায় এই লেখা বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করতেন তবে সেটি অবশ্যই ভাবার বিষয় হতো। আন্দোলনকারীদের আন্দোলনের যুক্তি এবং ভিত্তি এত পলকা নয় যে তা আমার একটি লেখার জন্য তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

ক) যতদূর জানি পরাগ রেণুর সঙ্গে পরাগ রেণুর মিলনেই উদ্ভিদের প্রাণচক্র চলতে থাকে। আর গাছ পাওয়া যায় বীজ থেকে। বীজ থেকে উদ্ভুত গাছের ফুলের পরাগ রেণু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মগুলি বহন করে। মানবজাতির কৃষিকাজ আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই এই পরাগ-মিলন চলে আসছে। কৃষিকাজ বহু নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে। ধরা যাক 'ক' গুণ সম্পন্ন একটি বীজ থেকে উদ্ভুত বীজের পরাগ 'খ' গুণ সম্পন্ন অন্য একটি বীজের পরাগের সঙ্গে নিষিক্তকরণের ফলে যে উদ্ভিদটি হলো তার বীজটির ধর্ম আবার সেই বীজের ফলে উদ্ভুত উদ্ভিদের ফুলের পরাগের মাধ্যমে অন্য উদ্ভিদে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যাদের মধ্যে ধর্ম ছড়িয়ে পড়বে, সেই বীজগুলিকে সংরক্ষণ করে ক্রমাগত চাষের মাধ্যমে তাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে— বা ঐ বীজটি নির্বাচিত করা হলো।

খ) ধরা যাক একটি পরিবারে বাদামী রঙের চোখ-সম্পন্ন কন্যার সঙ্গে অন্য একটি পরিবারের নীল রঙের চোখ-সম্পন্ন একটি ছেলের বিবাহ ঘটলো। এই দুই ব্যক্তি একই প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন জাত— না ভিন্ন বৈচিত্র্য সম্পন্ন?

গ) ছোটো করে আমি যেটা বলেছি, অর্থাৎ জৈব-প্রযুক্তির সংস্থাগুলোর দাবি যে 'বিটি জিন' শত্রুপোকার দ্বারা সৃষ্ট রোগ 'প্রতিরোধ' করবে, সেই বিষয়টি তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। বিটি জিন সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখা আমার সাধ্যাতীত, বড় বড় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরাও কোম্পানির টাকায় চলা গবেষণাকে খন্ডন করতে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেখানে আমার মতো চুনো-পুঁটি অধ্যাপক তা করতে অপারগ। ফসল সংক্রান্ত আলোচনার অংশ হিসেবে কোম্পানির দাবি মোতাবেক বিষয়টি রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র।

ঘ) বর্গীকরণ করার সময় যে কারণে ব্যাকটেরিয়াকে প্রাণী না বলে আলাদা গোষ্ঠীর জীব বলা হয়, সেই বিভেদ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যা প্রাসঙ্গিক, তা হলো বিটি জিন, গাছের জিন-সমষ্টিতে পরক— যদি এই জিন বা জিন-সমূহ থাকলে গাছের যোগ্যতম হিসেবে টিঁকে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা মিলতো, তবে তা এতদিনে (অর্থাৎ প্রজাতি সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত সময়সীমায়) গাছের জিন-সমষ্টিকে নিশ্চিন্তে সুস্থিত ভাবে এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তো। এর চেয়ে বেশি কিছু বলেছি বলে আমার লেখাটি থেকে প্রতিভাত হচ্ছে না।

ঙ) জিন-পরিবর্তিত বীজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের উৎপাদন সুস্থির নয়— গড়পড়তা কমতির দিকেই থাকে। আর অন্তত বিটি তুলোর ক্ষেত্রে, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং বিদর্ভ-র অভিজ্ঞতা হল এই তুলোর গাছগুলো অন্যান্য রোগের কবলে পড়ে। রোগাক্রান্ত হলে এবং তার চিকিৎসার জন্য যথেষ্ট সময় না মিললে মৃত্যু ঘটে। অপুষ্ট বীজও তৈরি হয়। পত্রলেখক আমার বাক্য-র মধ্যে কমা যতিচিহ্নটি উপেক্ষা করায় বাক্যটির দুটি অংশ দুটি পৃথক ব্যঞ্জনাময় বাক্যের পরিবর্তে একটি কারণ এবং অন্যটি ফল হিসেবে ধরে নিয়েছেন। (আমার ছাপানো কপিতে কমা চিহ্নটি রয়েছে, পত্রলেখকের কপিতে কি কমা যতিচিহ্নটি ছাপাখানার বিভ্রাটে দৃশ্যমান নয়?)

চ) টার্মিনেটর প্রযুক্তি নিয়ে এই প্রবন্ধে কোথাও কোনো কথা বলার দরকার হয়নি, তাই বলাও হয়নি। বীজ বাঁজা হয়ে যাওয়া আর টার্মিনেটর প্রযুক্তি যে এক নয়— এমন কথা সবাই জানে বলে ধরে নিয়ে আমি কিছু বলিনি। বিটি জিন বাঁজা বীজ তৈরি করে এমন কথাও বলিনি। যা বলেছি তা হলো সাধারণ রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা হারিয়ে বীজ তার নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে না। এমন একটা না করতে পারা কাজ হলো পুনরুৎপাদন করতে না পারা। যদি পুনরুৎপাদনের অক্ষমতাকে পত্রলেখকের 'বাঁজা' বলতে আপত্তি থাকে তো পুনরুৎপাদনে অক্ষমতা বলা যাক। কোম্পানিগুলোও এটাই চায়--- সহজ-সরল শব্দের পরিবর্তে কঠিন শব্দের ব্যবহার, যেমন টার্মিনেটর প্রযুক্তি!

ছ) আগাছা নাশক রাউন্ড-আপরেডি কথাটা ঠিক— কীটনাশক বলতে আমি চাষীরা যাকে বিষ বলে থাকেন সেটাই বুঝিয়েছি। সাধারণভাবে আমরা পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড ইত্যাদি আলাদা করি না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিশ্চয় আলাদা করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে 'আগাছা-নাশক'-কে 'কীট-নাশক' (অর্থাৎ বিষ অর্থে) বললেও মূল যুক্তি অপরিবর্তিত থাকবে— মূল যুক্তিটি মনস্যান্টো-র ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া। পাঠকরা আমার লেখা পড়ে ঠকতে না চাইলে আগমার্কা ওয়েবসাইটটি দেখুন।

জ) পত্রলেখক আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন রাইসটেক সংক্রান্ত পেটেন্টটির সংখ্যাসহ বিবরণের উল্লেখ করে। আমার লেখায় না ঠকে গিয়ে উৎসাহী পাঠকবৃন্দ পেটেন্টটির বয়ান পড়ে নিন। ইন্টারনেটে রাইসটেক, বাসমতী এবং পেটেন্টের সংখ্যাটি দিলে পুরো পেটেন্টেটির পূর্ণ বয়ান মিলবে। পেটেন্টের দাবিগুলি পড়ুন, পড়ুন যে দাবিগুলি মাঝে মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলোও। এই নিয়ে বহু লেখা আছে। আর বাসমতী চালের চাহিদা, তার বিপনন, অর্থনীতির বিষয়টি এতই জটিল যে তা আমার মতো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন অধ্যাপকের অনায়ত্ত।

ঝ) একেবারে শেষে বিচ্ছিন্ন যে উদ্ধৃতিটি (...জিন সংস্থাপন সম্ভব ইত্যাদি) থেকে পত্রলেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ঠিক বুঝলাম না। যাঁরাই জিন-প্রযুক্তি করেন, তাঁদের প্রচ্ছন্ন বা উচ্চারিত একটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধই মাত্র বলেছি। ওটা আমার কথা নয়— বরং আমার বক্তব্য যে এই ধারণাটি ভ্রান্ত। কেন ভ্রান্ত, তার একটা যুক্তি পত্রলেখক নিজেই পাঠকদের জ্ঞাতার্থে পেশ করেছেন।

পত্রলেখকের প্রদত্ত পাঠ্য তালিকায় আমি আর একটি বই যোগ করবো। অধ্যাপক তুষার চক্রবর্তীর লেখা 'জিন প্রযুক্তি— ভাবনা ও দুর্ভাবনা'।

— শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।